Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্রষ্টা ধর্ম জীবন

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্রষ্টা ধর্ম জীবন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

	স্রষ্টা ধর্ম জীবন
লেখক	ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স
ভাষান্তর	মাস'ঊদ শারীফ, মোদাসসের বিল্লাহ্‌, সানজিদা শারমিন, কবির আনোয়ার
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক, শরীফ আবু হায়াত অপু
অলংকরণ	আব্‌দ আল আহাদ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরিফুল আলম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্রষ্টা ধর্ম জীবন

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স

মূল বই

True Religion of God
Purpose of Creation
Is there any True Religion
Did God become Man

ভাষান্তর

মাস'ঊদ শারীফ
মোদাসসের বিল্লাহ
সানজিদা শারমিন
কবির আনোয়ার

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শরীফ আবু হায়াত অপু

শার'ঈ সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৬

শুরুর কথা ৭

প্রথম অধ্যায় : জীবন ১৩

- সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১৪
- সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ১৯
- স্রষ্টার অনুগ্রহ ও করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ২১
- সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্রষ্টা ৩১

- স্রষ্টাকে কীভাবে চেনা যায় ৩২
- সৃষ্টিকে যখন স্রষ্টা মনে করা হয় ৩৮
- স্রষ্টাকে মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা ৪৫
- মানুষকে স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নীতকরণ ৪৬
- স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে বিভ্রান্তির মূল কারণ ৪৭
- স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনো এক বা একাকার হতে পারে না ৪৯
- স্রষ্টার কি সন্তান থাকতে পারে? ৫১
- স্রষ্টাই কেবল সৃষ্টির উপাসনা লাভের অধিকার রাখেন ৫৩

তৃতীয় অধ্যায় : ধর্ম ৫৫

- সত্য ধর্মের নয়টি বৈশিষ্ট্য ৫৭
- অন্যান্য ধর্মগুলোর বিশুদ্ধতার দাবি ও বাস্তবতা ৭০
- স্রষ্টা কেন তার অনুগ্রহের অসম বন্টন করলেন? ৭২
- বিপদ ও বিপর্যয় কেন আসে? ৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রকাশকের কথা

এ ধরণিতে বহু মানুষের বসবাস, চলাচল। নানান তাদের পরিচয়: ভৌগোলিক-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা কিছুটা আধুনিক। সম্ভবত তা জীবনযাপনের যান্ত্রিকীকরণের ফলে। নগরায়ণের ফলে। প্রকৃতির সংস্পর্শহীনতার ফলে। অন্য কারণও থাকতে পারে। নৃতত্ত্ববিদেরা গবেষণা করবেন তা নিয়ে। জার্নালে ছাপা হবে। ব্যক্তির পাবলিকেশনের সংখ্যা বাড়বে। মানবসভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডারে যুক্ত হবে আরেকটি বিন্দু। কিন্তু পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ তাদের যাপিত জীবনে অবিরত থাকবে।

অধুনা চিন্তাবিদদের অনেকেই মনে করেন বর্তমান পৃথিবীতে বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা মুসলিম নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মহীনেরা। ধর্মহীনতার সংজ্ঞা সংশয়াতীত নয়। সাংস্কৃতিকভাবে নাস্তিকেরাও নিজেদের সাথে একটি ধর্মের সংলগ্নতা রক্ষা করেন। এই যোগসূত্রটা ভাষা কিংবা আত্মীয়তার মতো তা নেহায়েত জন্মসূত্রে পাওয়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুশাসনের প্রতি বিদ্রোহ হয়তো করে না, তবে সুলুকসন্ধানও করে না। চিন্তাশীল উদ্যোগের মাধ্যমে যৌক্তিকতার সিঁড়ি বেয়ে ধর্মপ্রাপ্তির সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়; বস্তুবাদে মত্ত মানুষ ধর্মহীনই থেকে যায়।

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্‌স প্রাচ্যের প্রতিনিধি। বস্তুবাদের ধারক-বাহক দেশে বেড়ে ওঠা। ধার্মিকতার বাতাবরণ আর সাম্যবাদী আন্দোলন দুটো ভিন্নমুখী ঢেউ তুলেছিল তার জীবনে। সত্যাগ্রহী বিধায় পথ সন্ধান করে গেছেন। একটি পথকে সত্য হিসেবে বেছেও নিয়েছেন। চারটি ছোট পুস্তিকাতে তার এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিব্রাজনকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। *সিয়ান পাবলিকেশন-এর* পক্ষ থেকে আমরা সে ভ্রমণকাহিনির নির্যাসটুকু উপহার দিতে চেয়েছি। শুধু স্রষ্টা বা ধর্ম নিয়ে তত্ত্বকথা নয়, জীবনের কথাও আছে এতে। আছে মানবজনমের বড় বড় ধাঁধাঁগুলোর জবাব খোঁজার প্রয়াস।

ধার্মিক কিংবা ধর্মহীন—চিন্তাশীল মানুষদের জন্য এ বই। বস্তুজগতে একটি বাতায়ন উন্মোচন করবে এ বই। এমন এক ছবি দেখাবে যা বস্তুবাদের চশমা আঁটা চোখে দেখা সম্ভব নয়। সিয়ান পরিবারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ রইল সেই ছবিটি দেখার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- স্রষ্টা বলতে কি আসলেই কেউ আছেন?
- আমাদের এই জীবনের অর্থ কী?
- এ বিশ্ব চরাচর মহাজাগতিক একটি দুর্ঘটনার ফলাফল মাত্র!
- আস্তিকতা কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ?
- স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসই ধার্মিকতার মাপকাঠি নয়।

শুরুর কথা

- যে কোনো একটি ধর্ম মানলেই কি চলে?
- 'সব ধর্মই গ্রহণযোগ্য' তত্ত্বের প্রবক্তারাও একটি ধর্মই অনুসরণ করে।
- স্রষ্টা কি বিশ্বজগত তৈরী করে একে ভুলে যাননি।
- ধর্ম-কর্ম কি বৃদ্ধ বয়সের বিনোদন?
- মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে কী কারণে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য যিনি তা পাওয়ার উপযুক্ত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁদের উপর যারা তা পাওয়ার যোগ্য।

মানুষ এবং বিশ্বজগতের জটিল ও সুনিপুণ সৃষ্টিশৈলীর দিকে তাকালে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে, অবশ্যই একজন মহান সার্বভৌম সত্তা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এই অনুপম বিন্যাস ও নির্মাণশৈলী একজন সুনিপুণ নির্মাতার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। সাগরের বেলাভূমিতে কারও পায়ের ছাপ দেখে আমরা সাথে সাথে বলে দিতে পারি যে, কিছুক্ষণ আগেই কেউ একজন এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়েছে আর অমনি কাকতালীয়ভাবে মানুষের পদচিহ্নের ছাপ পড়ে গিয়েছে—এমন কোনো অলীক ধারণা কখনোই আমাদের মাথায় আসে না। অনুরূপভাবে সৃষ্টিজগতের সব নিদর্শন দেখার পরও এসবের কোনো স্রষ্টা নেই—এমন দাবি করা একেবারেই অন্যায় এবং অযৌক্তিক।

সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও সব যুগেই কিছু মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতে, পদার্থসমূহ শাশ্বতকাল থেকেই বিদ্যমান, আর মনুষ্যজাতি হলো কেবলই এই উপাদানগুলোর আকস্মিক সমন্বয়ের একটি সৃষ্টি। তাই 'কোনো সত্য ধর্ম আছে কি না কিংবা জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না?'—এসব প্রশ্ন তাদের কাছে একেবারেই অবান্তর। কারণ, তারা এমন কোনো প্রভুতেই বিশ্বাস করে না যিনি ধর্ম নাযিল করতে পারেন। তাদের মতে, আমাদের এই জীবনেরও কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। কারণ, সবকিছুই মহাজাগতিক একটি দুর্ঘটনার ফলাফল মাত্র!

অন্যদিকে সৃষ্টির শুরু থেকে মানবজাতির প্রায় সবাই বিশ্বাস করে এসেছে এবং এখনো বিশ্বাস করে যে, একজন মহান সার্বভৌম সত্তা কোনো একটি উদ্দেশ্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই বুদ্ধিমানদের উচিত সেই সত্তা সম্পর্কে, তাঁর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তাঁর মনোনীত ধর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে জানা।

পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট দেশগুলোতে সম্প্রতি নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ার পরও পরিসংখ্যান ঘেটে দেখা যায় যে, সেখানকার অধিকাংশ মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাসী। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপর ইউরোপের প্রায় চৌদ্দটি দেশে জরিপে চালিয়ে Reader's Digest সম্প্রতি এ বিষয়ক একটি ফলাফল প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দশ জনে সাত জনই স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। তাদের জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে পোল্যান্ডের শতকরা ৯৭ ভাগ মানুষ স্রষ্টায় বিশ্বাসী; যদিও তা পূর্বে একটি কমিউনিস্ট দেশ ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কমিউনিজমের জন্মভূমি রাশিয়াতে ৮৭ ভাগ মানুষই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শাখার বিজ্ঞানীদের উপর সমীক্ষা চালিয়েও দেখা গেছে যে, তাদের অধিকাংশই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে।

অধিকাংশ মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও ধর্মের উপর তাদের বিশ্বাস খুবই কম—বিশেষ করে পশ্চিমাদের মধ্যে। কেউ কেউ মনে করেন, এত ধর্মের মধ্যে একজন মানুষ কীভাবে সঠিক ধর্ম বাছাই করবে? কেননা প্রতিটি ধর্মই সত্য ধর্ম হওয়ার দাবি করছে! আর সবগুলো ধর্ম যেহেতু একসাথে সঠিক হতে পারে না, তাই তারা সবচেয়ে সহজ সমাধান হিসেবে সবগুলো ধর্মকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। এ রকম চিন্তাধারার ফলেই ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা দেশগুলো ধর্মকে নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে আখ্যা দেয় এবং সব ধর্মকে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করে। এ কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো ধর্মকে অন্য ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়নি।

আন্তঃধর্মীয় মতবিনিময় ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব সভা-সেমিনারে বলা হয় যে, কে কোন ধর্মের অনুসরণ করছে সেটা কোনো মুখ্য বিষয় নয়, যতক্ষণ সে তার ধর্মের ব্যাপারে আন্তরিক। কোনো একটি ধর্মকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে দাবি করাকে সেকেলে, অবিবেচনাপ্রসূত এবং চরমপন্থা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়।

এসব পণ্ডিতেরা কোনো ধর্মকে একমাত্র সত্যধর্ম সাব্যস্ত করতে কুণ্ঠিত হলেও তাদের নিজেদের অনুসৃত ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলতে ঠিকই গর্ববোধ করে থাকেন। আবার একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বেছে নিয়ে তা অনুসরণ করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেবল একটি ব্যতীত সবগুলো ধর্মই মিথ্যা অথবা সবগুলোই সত্য। যদি সবগুলোই সত্য হয় তবে তাদের আদর্শ বিশ্বাস তো একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তব কথা হলো, সবগুলো ধর্ম সত্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব, কারণ প্রতিটি ধর্মে রয়েছে পৃথক পৃথক মতাদর্শ। তাই অনিবার্য সত্য হলো, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যে ধর্ম নাযিল করেছেন সেটাই একমাত্র সত্য ধর্ম।

কিছু লোক দাবি করে যে, পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা স্রষ্টার কাছে সমগ্র বিশ্বজগতের তুলনায় এতই নগণ্য যে, এগুলোর প্রতি তাঁর কোনো খেয়ালই নেই। তাদের মতে, স্রষ্টা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পৃথিবী সৃষ্টি করে এটিকে এর মতো করে ছেড়ে দিয়েছেন। একইভাবে তারা মনে করে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে সে বিষয়ে তিনি কোনো দিকনির্দেশনা দেননি। এই দাবি একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ, মহান স্রষ্টা মহাপ্রজ্ঞাময় এক সত্তা। এটা তাঁর শাশ্বত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত; তিনি সৃষ্টি করবেন অথচ ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের জন্য আমাদের কোনো নির্দেশনা দিবেন না—তা হতে পারে না। স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে যদি তাদের জন্য কোনো জীবনবিধান না-দেন তখন স্বাভাবিকভাবেই মানবজাতি দ্বিধা ও বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হবে। গোটা পৃথিবীর অবস্থা তখন হয়ে যাবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, অরাজক। পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে যে-নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ—স্রষ্টার দেওয়া জীবনধারা সম্পর্কে মানুষের অসচেতনতা অথবা সেগুলো মেনে না চলা।

যদি একটি কারখানা নির্মাণ করে সেখানে লোক নিয়োগ দেওয়া হয় কিন্তু তাদের দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেওয়া হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা বাতলে না দেওয়া হয় তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তারা ঠিকমতো কাজ করবে না। তাদের কী করতে হবে তারা যদি তা না-ই জানে তবে কখনোই তারা কাঙ্ক্ষিত কাজ করতে সক্ষম হবে না। কোনো হাসপাতাল, বিদ্যালয় অথবা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। একইভাবে যেকোনো প্রতিষ্ঠানেরই কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই মহাবিশ্ব ও এর ভেতর যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং একটি জীবনবিধান দিয়ে দিয়েছেন। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সফলতার জন্য মানুষের উচিত স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান মেনে চলা। বস্তুত 'স্রষ্টা কোনো ধর্ম নাযিল করেননি' দাবি করা 'স্রষ্টা বলতে কেউ নেই' দাবিরই নামান্তর। সঠিক অর্থে স্রষ্টায় বিশ্বাস বলতে নিছক তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসকে বোঝায় না; বরং 'তিনি মানবজাতির জন্য শাশ্বত সত্য এক ধর্ম নাযিল করেছেন এবং তা মানা সবার জন্য অপরিহার্য'—এই বিশ্বাসও এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া ﷺ -কে সৃষ্টি করে তাদেরকেও কীভাবে দুনিয়ায় চলতে হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। মূলত সব মানুষের জন্য সুমহান আল্লাহ যে ধর্ম নাযিল করেছিলেন সেটাই হলো একমাত্র শাশ্বত ও সত্য ধর্ম। তিনি একেক সময় একেক ধর্ম নাযিল করেননি; সেটা বিভ্রান্তিকর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখন প্রশ্ন: 'পৃথিবীর এই নানা রকম ধর্মের মধ্যে কোনটি আল্লাহর মনোনীত সঠিক ধর্ম?' উত্তরটি খুঁজে বের করতে হলে আপনাকে অবশ্যই উদার মনের অধিকারী হতে হবে এবং অন্ধভাবে পূর্বপুরুষের ধর্ম অনুসরণের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনি আন্তরিক হলে সে সত্য ধর্মের সন্ধান লাভ করা মোটেই অসম্ভব নয়; কারণ স্রষ্টার মনোনীত সত্য ধর্মকে শনাক্ত করার জন্য তিনি প্রতিটি মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন।

কোনো ব্যক্তি ব্যবসার উদ্যোগ নিলে কোন ধরনের ব্যবসায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি প্রথমে সে সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজখবর নেয়। শুধু খোঁজখবর নিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করার জন্য নানা রকম সৃজনশীল ও অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মানুষ সামান্য ব্যবসাকে অনেক গুরুত্বের সাথে নেয়; অথচ ধর্মের ক্ষেত্রে তারা মারাত্মক অমনোযোগী! আবার কিছু লোক কেবল বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার পরই ধর্মকর্মের প্রতি ঝোঁকে।

অনেকে ধর্মের সমালোচনা করে; যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের ভোগান্তি এবং সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের জন্য তারা ধর্মকে দায়ী করে। অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং বর্তমান সময়ের ইরাক যুদ্ধকে ধর্মীয় কারণে সংঘটিত যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে যে, ধর্মের কারণে সংঘটিত যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় খুবই নগণ্য। তাই এই দাবিকে সত্য ধর্ম খুঁজে নেওয়া থেকে বিরত থাকার কোনো বৈধ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

যে-মানুষটি স্রষ্টায় বিশ্বাস করে তার কাছে এটা স্পষ্ট যে, স্রষ্টা অবশ্যই সৃষ্টির জীবন ধারণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মৌলিক সৃষ্টিগত দিক থেকে সব মানুষই যেহেতু একই প্রকৃতির, তাই তাদের একেক দলের জন্য একেক রকম পদ্ধতি নির্ধারণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে হাম্মুরাবিদের আইন-ব্যবস্থাকে যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, বর্তমান এই আধুনিক সমাজের সমস্যার ধরনপ্রকৃতিও একই রকম। হাম্মুরাবির সহস্র বছর পূর্বে সবচেয়ে প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে একই বিষয় বিবৃত হয়েছে। *রসেটা স্টোন* নামে খ্যাত প্রাচীন মিশরীয় শিলালিপিতে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত যে ধরনের জটিলতা বিবৃত হয়েছে বর্তমান এই আধুনিক যুগেও মানুষ প্রতিনিয়ত সেই একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিগত শত, সহস্র এমনকি লক্ষ বছরের ব্যবধানেও মানুষের মধ্যে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে কেন স্রষ্টা এক দল মানুষের জন্য এক রকম জীবনবিধান আর অন্যদের জন্য আরেক রকম জীবন বিধান দেবেন? তাই প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত সব মানুষের জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে একটি জীবনবিধান দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। যদি স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনো জীবনবিধান দিয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য হবে।

প্রতিটি মানুষকেই মহান স্রষ্টা সঠিক ধর্মকে শনাক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কারও বাপ-দাদা একটি ধর্মের অনুসরণ করেছে বলেই সেটাকে সঠিক ধর্ম মনে করা অনুচিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্রষ্টা মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তা নামক এক মহান নিয়ামত। কিন্তু মানুষ জাগতিক বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করলেও ধর্মীয় বিষয়ে তারা যেন অনেকটা নির্বোধের মতো আচরণ করে। অনেক সময়ই তারা বংশ-পরম্পরায় পাওয়া অনেক হাস্যকর ধর্মীয় আচার-প্রথা পালন করে থাকে। স্রষ্টার ইচ্ছায়ই মানুষ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। তাই বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সে কোন ধর্ম পালন করেছে তার ভিত্তিতে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।

প্রত্যেক মানুষের উচিত তার চারপাশের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা এবং সঠিক ধর্মের সন্ধান লাভে সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা। এই কাজের জন্য ব্যক্তির কাছে কতগুলো মানদণ্ড থাকতে হবে, যেগুলোর ভিত্তিতে সে খোলা মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে সঠিক ধর্মটিকে খুঁজে বের করতে পারবে। কেননা প্রতিটি ধর্মই দাবি করছে যে, সেটা স্রষ্টার মনোনীত সত্য ধর্ম। প্রতিটি ধর্মকে সত্য ধর্ম দাবি করার পেছনে যে যুক্তিগুলো দেওয়া হয় সেগুলো যাচাই বাছাই করার মাধ্যমে সত্য অন্বেষণের এ চেষ্টা শুরু করা যেতে পরে।

জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার কাজটিকে অবহেলা করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। প্রাপ্ত তথ্য ও তত্ত্ব-উপাত্তের উপর নিজের বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ ও আন্তরিক প্রয়োগ করে স্রষ্টার মনোনীত এ সত্য ধর্মের সন্ধান আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, আপনার সঠিক সিদ্ধান্তের সুফল যেমন আপনি পাবেন, তেমনি আপনার ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতিও আপনাকে ভোগ করতে হবে।

হ্যাঁ, আপনাকেই, একমাত্র আপনাকেই...।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- কেন এই বেঁচে থাকা?

- পুরো বিশ্বটাই মিথ্যে, কাল্পনিক!

- মানবজাতির কথিত 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী' বানর যদি অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত না হয় তবে মানুষের এত মাথাব্যথার কারণ কী?

- কেন পৃথিবীতে এসেছি?—এ প্রশ্নের উত্তর মানুষ দিতে পারে না।

- স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে ভালো কিংবা মন্দ উভয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

প্রথম অধ্যায় : জীবন

- ইহকালে যাপিত জীবন অনন্ত শাস্তির ন্যায্যতা এবং মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়।

- আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

- স্রষ্টা যেকোনো প্রয়োজন থেকে মুক্ত। মানুষের ইবাদাত আপন স্বার্থে ।

- আল্লাহর নির্দেশ আর আল্লাহর দেওয়া স্বাধীনতা এক কথা নয়।

- '*ইবাদাহ* : আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি স্বেচ্ছা আত্মসমর্পণ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকটি মানুষকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় ভাবিয়ে তোলে। সবাই একটি সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করে,

'আমি কেন বেঁচে আছি?' বা,

'আমার এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কী?'

মানুষ এবং বিশ্বজগৎ উভয়ের গঠনগত বৈচিত্র্য এবং জটিলতা প্রমাণ করে যে, এসব কিছুর নিশ্চয়ই একজন মহান স্রষ্টা রয়েছেন। কেননা, শিল্পের মাঝেই তো শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়।

'কেন মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করলেন?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বুঝতে হবে যে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বা কার পক্ষ থেকে প্রশ্নটি করা হচ্ছে। প্রশ্নটি যদি মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা করেন তাহলে এমন শোনাবে: 'কোন বিষয়টি মানুষ সৃষ্টি করতে আল্লাহকে উদ্বুদ্ধ করেছে?' আর মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটি করা হলে তা হবে এমন যে: 'কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করলেন?' দুটো প্রশ্নই একটি অমোঘ প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরে। আর সেই প্রশ্নটি হচ্ছে: 'কেন আমার এ অস্তিত্ব?'

এটা কোনো অনুমান করার বিষয় নয়। কারণ, মানুষের অনুমান এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম নয়। মানুষের জ্ঞান তো সামান্যই—তার নিজের মস্তিষ্ক কিংবা মন কীভাবে কাজ করে তা-ই সে ভালোমতো বুঝতে পারে না! তাহলে সে কীভাবে শুধু তার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নিজ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য অনুধাবন করবে? এ কারণেই দেখা যায় যে, যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করা দার্শনিকেরা অনুমান-নির্ভর এমন সব উত্তর দিয়েছেন যার কোনোটিই প্রমাণ করা যায় না। এমনকি কেউ কেউ এ ধরনের কথাও বলেছেন যে, 'আমাদের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই এবং এই পুরো বিশ্বটাই কাল্পনিক।' গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৮-৩৪৮) মতে, আমাদের চারপাশের নিয়ত পরিবর্তনশীল যে জগৎকে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিনতে ও জানতে পারে, সে জগৎই প্রকৃত বাস্তবতা নয়; বরং তা হলো মূল বাস্তবতার ছায়াজগৎ মাত্র।[১]

[১] তার রচিত *দি রিপাবলিক* নামক বইতে বহুল ব্যবহৃত গুহার উপমার মাধ্যমে এই দর্শন বর্ণনা করা হয়। সেখানে গুহার দেওয়ালে খোদাইকৃত ছবির ছায়ার সাথে নিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতের তুলনা করা হয়েছে। (*দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়া*, খণ্ড-২৫, পৃ. ৫৫২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এছাড়া অনেকে ইতিপূর্বে দাবি করেছেন এবং এখনো অনেকে করে যাচ্ছেন যে, মানবজাতির সৃষ্টির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাদের মতে মানুষের অস্তিত্ব নেহাতই একটি ঘটনা। যদি অজৈব বস্তু থেকে ঘটনাক্রমে জৈব বস্তুর সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে আসলেই জীবনের কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। মানবজাতির কথিত 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী' বানর এবং বনমানুষেরা যদি অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত না হয় তবে মানুষের এত মাথাব্যথার কারণ কী?

অধিকাংশ মানুষই 'আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?'—এই প্রশ্ন নিয়ে কদাচিৎ সামান্য চিন্তাভাবনা করলেও পরক্ষণেই আবার প্রশ্নটিকে মনের কোণে ঠেলে দেন। অথচ এই প্রশ্নের উত্তর জানা মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা না থাকলে মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। ফলে পানাহার এবং প্রজননের মতো নিছক জৈবিক চাহিদা পূরণই মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণে মানুষের সব কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা কেবল বল্গাহীন এসব চাহিদা পূরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

নিছক জৈবিক লালসা পূরণই যখন কারও জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয় তখন সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মানুষ তার নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত তার বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার করতেই থাকবে। অধঃপতিত মানব মন তখন তার সামর্থ্য জাহির করবে মাদক আর বোমা বানিয়ে; পুলকিত বোধ করবে নিজেকে ব্যভিচার, পর্নোগ্রাফি, সমকামিতা, ভবিষ্যৎ গণনা আর আত্মহত্যার মতো বিভিন্ন অপরাধে নিমজ্জিত করে।

জীবনের উদ্দেশ্য না জানলে একজন মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে সে জীবনটি শুধু শুধু অপচয় হয়। উপরন্তু, পরকালের অনন্ত সুখের জীবনের পুরস্কার থেকেও সে বঞ্চিত হয়। তাই একজন মানুষের জীবনে 'কেন আমরা পৃথিবীতে এসেছি?'—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না।

মানুষ সাধারণত তাদের মতোই অন্যান্য মানুষের কাছে এই প্রশ্নের জবাব খোঁজে। কিন্তু এই প্রশ্নের স্পষ্ট এবং নির্ভুল উত্তর পাওয়ার একমাত্র উৎস হচ্ছে ঐশী গ্রন্থসমূহ। মানবজাতি নিজে থেকে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর উদ্‌ঘাটনে সম্পূর্ণ অপারগ। তাই নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর প্রত্যেক নবী তাঁর অনুসারীদের এ বিষয়টি নির্ভুলভাবে শিখিয়ে গেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'কেন আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন'—এই প্রশ্ন উত্থাপন করার যৌক্তিকতা এই যে, মহান আল্লাহ নিজেই কুরআনে বলেছেন, তার সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতিই সর্ববৃহৎ সৃষ্টি নয়:

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করা অনেক বড় কাজ; যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (আল গাফির, ৪০:৫৭)

মানুষের গঠন প্রণালীর চেয়ে যে-বিশ্বজগতে সে বাস করে তার গঠন অনেক বেশি জটিল। কিন্তু খুব কম মানুষই এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে।

মহান স্রষ্টা কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তা ভাবার সময় আরও একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আর তা হলো, সৃষ্টিকর্তা হওয়ার জন্য সর্বপ্রধান যে ঐশ্বরিক গুণ থাকা অপরিহার্য তা হলো, সৃষ্টি করার অসীম ক্ষমতা। যে সত্তা কোনো কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না তার ক্ষেত্রে স্রষ্টা পরিভাষাটি ব্যবহার করাই একটি সাংঘর্ষিক ব্যাপার। তবে তার মানে এই নয় যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী বা তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ সব প্রয়োজন থেকে মুক্ত; সব সৃষ্টিরই বরং আল্লাহকে প্রয়োজন। তবে, একজন লেখকের দক্ষতা ও নৈপুণ্য যেমন তার লেখায় ফুটে ওঠে, তেমনিভাবে সৃষ্টি করার ঐশ্বরিক গুণ তাঁর নিখুঁত সৃষ্টিশৈলীর মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি করাটা একমাত্র আল্লাহরই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন এবং আধুনিক কিছু দার্শনিক শূন্য থেকে আল্লাহর সবকিছু সৃষ্টি করার ব্যাপারটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে তারা এই বিশ্বজগৎ এবং এর অন্তর্ভুক্ত সবকিছুকে স্রষ্টারই অংশ বলে দাবি করে বসেছেন।[১] তাদের মতে, স্রষ্টা তাঁরই একটি অংশ থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যেহেতু শুধুমাত্র সৃষ্ট বস্তুকে পরিবর্তন বা রূপান্তর করার মাধ্যমেই নতুন কিছু 'সৃষ্টি' করতে পারে, তাই তারা মানুষের এই অক্ষমতার সাথে আল্লাহকে তুলনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ আল্লাহর

---

[১] ব্রহ্ম বা সর্বোচ্চ বাস্তবতা বিষয়ে হিন্দু বিশ্বাসও একই রকম। ঋগবেদের শেষ (১০ম) গ্রন্থে মহাজাগতিক মানবের বন্দনা (পুরুষাসুক্ত) অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম অগ্নি-উৎসর্গের সময় একজন মহাজাগতিক মানবের (পুরুষা) দেহের পুড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বিভিন্ন অংশ থেকে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তার শরীর থেকেই চারটি বর্ণ বা গোত্রের উৎপত্তি হয়। মুখ থেকে পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), বাহু থেকে যোদ্ধা (রাজন্য), উরু থেকে কৃষক (বৈশ্য) এবং পা থেকে ভৃত্য (শূদ্র) গোত্রের সৃষ্টি হয়। (*দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়া*, খণ্ড-২০, পৃ. ৫৩১)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ওপর মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এমন সব উপমাকে আল্লাহ কুরআনে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।' (আশ-শুরা, ৪২ : ১১)

তাই স্রষ্টা হওয়ার ঐশ্বরিক গুণের বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সৃষ্টির অসীম ক্ষমতার মধ্যে। এ জগতের সবকিছুর একমাত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ। আর এই বিষয়টি আমাদেরকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করানোর জন্য আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে সৃষ্টিকর্তা বলে বর্ণনা করেছেন।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (আয-যুমার, ৩৯:৬২)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা তৈরি করো তা-ও।
(আস-সাফফাত, ৩৭:৯৬)

মানবজাতিকে আরও উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চাওয়া বা কারও কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা একটি মারাত্মক ভুল। অজ্ঞতার কারণে মানুষ দুর্ভাগ্য এড়াতে এবং কল্যাণ লাভ করতে নানা রকম তাবিজ-কবচ, জ্যোতিষীশাস্ত্র, হস্তরেখাবিদ্যা প্রভৃতির আশ্রয় নেয়। তাই মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনের সূরা আল ফালাকে শুধু আল্লাহর কাছেই অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

বলো, আমি আশ্রয় চাই ভোরের প্রভুর কাছে; তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।
(আল ফালাক, ১১৩:১–২)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ সব অকল্যাণ থেকে মুক্ত; বরং তিনি কল্যাণময়। তবে তিনি এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন যেখানে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালো কিংবা মন্দ উভয় কাজ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এই মহাবিশ্বে কোনো ভালো বা খারাপ কাজই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর 'অনুমতি' ছাড়া ঘটতে পারে না। আর এ কারণেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য এবং আশ্রয় চাওয়া নিরর্থক:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ

কোনো বিপদই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। (আত-তাগাবুন, ৬৪:১১)

'নবী মুহাম্মাদ ﷺ এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, জেনে রেখো, পৃথিবীর সব মানুষও যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তার চেয়ে বেশি কিছু তারা করতে পারবে না। আর যদি সব মানুষ তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত তোমার কোনো অনিষ্ট তারা করতে পারবে না।' [১]

মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে তাদের বসবাসের এ পৃথিবীর সাথে যুক্ত করে আরও বড় পরিসরে উত্থাপন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্নটি হবে, 'কেন আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করলেন?'

الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

তোমাদের মধ্যে কাজে কে সেরা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আল্লাহ মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, পুনঃপুনঃ ক্ষমাশীল। (আল মুল্‌ক, ৬৭:২)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا

পৃথিবীর সবকিছু আমরা[২] তার শোভায় পরিণত করেছি যাতে লোকেদের পরীক্ষা করে নিতে পারি, কে তাদের মধ্যে কাজে সেরা। (আল কাহ্‌ফ, ১৮:৭)

তবে মনে রাখতে হবে, এই পরীক্ষাগুলো মানবজাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাচাই করার জন্য নয়। কারণ তিনি সৃষ্টি করার আগে থেকেই তাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন। এই পরীক্ষাগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শেষ বিচারের দিনে জাহান্নামিদের জাহান্নামে নিক্ষেপের ন্যায্যতা এবং জান্নাতিদেরকে তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বোঝানো। এই পৃথিবীর

[১] ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত, সহীহ সুনান আত-তিরমিযি,খণ্ড-২, পৃ. ৩০৮-৯, হাদিস নং ২০৪৩।

[২] আরবি ভাষায় 'আমি' এর স্থলে ব্যবহৃত 'আমরা' দিয়ে রাজকীয় 'আমরা' বোঝায়। এটা দিয়ে আল্লাহকে বোঝানো হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জীবনের সব পরীক্ষারও দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে; এক, মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং দুই, শাস্তি অথবা পুরস্কার।

সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর সুবিচার এবং ন্যায়পরায়ণতার মতো গুণগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। আল্লাহ চাইলে তাঁর অসীম জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে পৃথিবীতে না পাঠিয়েই তাদের কিছু অংশকে জান্নাতে এবং বাকিদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কারণ একটি মানুষকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ জানতেন সে জীবনে কী কী সিদ্ধান্ত নেবে এবং সে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবে।

যারা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য তাদেরকে যদি আল্লাহ শুরুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন তবে তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত নিয়ে মোটেই প্রশ্ন তুলত না; বরং তারা খুশিমনে জান্নাতের আনন্দময় অনন্ত জীবনকে সানন্দে বরণ করে নিত এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত।

যাদের সরাসরি জাহান্নামে স্থান দেওয়া হতো তারা অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলত। পৃথিবীতে পাঠানো হলে তারা কী করত সেটা না জানার কারণে তাদের মনে হতো যে, তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তারা তর্ক জুড়ে দিত যে পৃথিবীতে জীবনযাপনের সুযোগ দেওয়া হলে তারা অবশ্যই ইসলামের প্রতি বিশ্বাস করত এবং ভালো কাজ করত। এ কারণেই আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তারা যে সিদ্ধান্তগুলো নিত সেগুলো নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এর ফলে যারা যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারা সবাই বুঝতে পারবে যে, তারা নিজেরাই জাহান্নামকে বেছে নিয়েছে। তখন তারা নিজেদের জীবনে আল্লাহর অনুগ্রহসমূহকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং আল্লাহর নিদর্শন ও পথনির্দেশ অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা যে পাপগুলো করেছে তা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ফলে তারা আল্লাহর বিচারকে ত্রুটিহীন এবং ন্যায়নিষ্ঠ বলে মেনে নেবে। তবে তারপরেও তারা আরেকবার পৃথিবীতে ফিরে এসে ভালো কাজ করার সুযোগ প্রার্থনা করবে। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا
أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি তুমি দেখতে—অপরাধীরা যখন তাদের প্রভুর সামনে মাথা নিচু করে বলবে, "আমাদের প্রভু, আমরা এখন দেখেছি, শুনেছি; আমাদের এবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠান। আমরা এখন ভালো কাজ করব, কারণ এখন আমরা সত্যিই সব বিশ্বাস করেছি।" (আস-সাজদা, ৩২:১২)

কিন্তু তারা জাহান্নামে যে শাস্তি ভোগ করেছে তা ভুলিয়ে দিয়ে যদি আল্লাহ আবার তাদের দুনিয়াতে ফেরত পাঠাতেন, তাহলে তারা খারাপ কাজ করে আবারও জাহান্নামেরই উপযুক্ত হতো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

বরং তারা আগে যা গোপন করত তাদের সামনে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আবার পৃথিবীতে পাঠানো হলে তাদের যা নিষেধ করা হয়েছিল, তারা পুনরায় তা-ই করত; কারণ তারা মিথ্যাবাদী। (আল আন'আম, ৬:২৮)

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে যাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও জীবন উপভোগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের অস্তিত্বের মাঝেই আল্লাহর ভালোবাসা উদ্ভাসিত হয়। যারা মন্দকে বর্জন করে ভালোকে বেছে নেবে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। এটাও তাঁর ভালোবাসার একটি নিদর্শন। মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ পাঠানো গ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করেন যে, তিনি ন্যায়পরায়ণ (৫:৪২), ধার্মিক (৯:৪), ধৈর্যশীল (৩:১৪৬), তাঁর ওপর ভরসাকারী (৩:১৫৯), তাঁর পথে অবিচল যোদ্ধা (৬১:৪), তাঁর কাছে পুনঃপুনঃ তাওবাকারী ও নিজেদের পরিশুদ্ধকারী (২:২২২) এবং যারা ভালো কাজ করে (৫:১৩) তাদের ভালোবাসেন। তবে ভালোত্ব, ন্যায়পরায়ণতা এবং ধার্মিকতা বলতে আল্লাহ কী বুঝিয়েছেন তা তিনি নিজেই তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং নবীদের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তাই যারা নবীদের অনুসরণ করে তাদেরই আল্লাহ বেশি ভালোবাসেন। সূরা 'আল ইমরানে আল্লাহ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলার নির্দেশ দিয়েছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ, আল্লাহ পুনঃপুনঃ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। ('আল ইমরান, ৩:৩১)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর নির্দেশিত কাজগুলোতে নবীদের অনুসরণ করতে হবে। একইভাবে ঐচ্ছিক ইবাদাতের প্রতি তাঁদের যে আগ্রহ ছিল সেটিও আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সবার প্রতি আল্লাহর দয়া এবং অনুগ্রহের মধ্যেও আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশ পায়। তবে যারা সত্যিই তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার আগ্রহের মাঝেই যেন আল্লাহর ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। পাপ মোচনের উপায় হিসেবে সব মানুষের জন্যই তাওবার দরজা খোলা রাখা হয়েছে। গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাওবা করার সুযোগ পাবে।

আনাস ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর বার্তাবাহক ﷺ বলেছেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন,"হে আদমসন্তান, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে তোমার কৃতকর্মের জন্য মাফ করে দিতে থাকব এবং আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান, তোমার পাপ যদি আকাশ ছুঁয়ে ফেলে আর তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে মাফ করে দেব। হে আদম সন্তান, তুমি যদি আমার সাথে কাউকে শরীক না করে পৃথিবী-ভরা পাপ নিয়েও আমার কাছে আস তবে আমিও তেমন বিশাল ক্ষমাশীলতা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব।"' [১]

স্রষ্টার অনুগ্রহ ও করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো

ক্ষমা, অনুগ্রহ এবং দয়ার মতো ঐশ্বরিক গুণাবলি মানবজাতির মাঝেও প্রতিভাত হয়। মানুষকে সৎ হিসেবে এবং ভালো ও মন্দ সম্পর্কে বোঝার সহজাত সচেতনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মাঝে কামনা-বাসনাও সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর বিধান অনুযায়ী এই কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করার কিংবা লাগামহীনভাবে প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহকে অমান্য করবে এটা জেনেই তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি আদম ﷺ থেকে শুরু করে সব মানুষকে তাওবার মাধ্যমে পাপ থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

[১] সহীহ সুনান আত-তিরমিযি, খণ্ড ৩,পৃ. ১৭৫-৭৬, নং ২৮০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদম এবং হাওয়া ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁরা আল্লাহর আদেশ ভুলে গিয়েছিলেন এবং শয়তান তাঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। তবে তাঁরা আল্লাহকে অমান্য করার পর তাওবা করে পুনরায় আল্লাহর প্রতি অনুগত হন এবং আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দেন। অবাধ্যতার পরে মানবজাতির পুনরায় তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার ঘটনার মধ্য দিয়েই আল্লাহর অসীম ক্ষমা এবং অপরিসীম করুণার ঐশ্বরিক গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সর্বশেষ নবী ﷺ তার সাহাবাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়ে বলেন, 'তোমরা যদি পাপ না করতে এবং তারপর ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে না-যেতে তবে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করতেন।'[১]

কুরআনের ১১৪টি সূরার একটি বাদে বাকি সবকটির শুরু হয়েছে 'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে'—এই প্রার্থনা দিয়ে। মানুষ যেন হতাশায় ডুবে না যায় সেজন্য আল্লাহর ক্ষমা এবং করুণার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাপ যত বড়ই হোক না কেন, কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করে এবং ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করার সময় করুণাকে আল্লাহ নিজের ওপর আবশ্যক করে বলেন: "আমার অনুগ্রহ আমার রাগের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।"'[২] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, 'আল্লাহ দয়াকে একশ ভাগে ভাগ করেন। এর এক ভাগ তিনি জ্বিন, মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীর মাঝে ভাগ করে দেন। এই এক ভাগের অংশবিশেষের প্রভাবেই তারা একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপরের প্রতি দয়ালু হয়। এমনকি পশুপাখিও তাদের বাচ্চাদের স্নেহের সাথে পালন করে। আর বাকি ৯৯ ভাগ আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে তাঁর প্রকৃত আনুগত্যকারীদের জন্য নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।'[৩]

ফেরেশতাগণ যেমন পাপ করতে অক্ষম, আল্লাহ চাইলে মানুষকেও তেমন করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু সেটি তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, কারণ তিনি তো এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেনই। মানুষকে ভুল করার সামর্থ্য দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে

---

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৩৫-৩৬, নং ৬৬২১, আবু আইয়ুব আল আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।
[২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৩৭, নং ৬৬২৮, আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।
[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৩৭, নং ৬৬৩১, আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাতে করে ভুল বুঝতে পারার পর তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। আর এর মাধ্যমে যেন আল্লাহর দয়া এবং ক্ষমাশীলতার গুণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়।

মানুষ শুধুমাত্র তাদের ভালো কাজের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহর অনুগ্রহই শেষ পর্যন্ত তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে। নবী ﷺ এই বিষয়ে বলেছেন, 'সাধ্যমতো সৎ কাজ করো এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। কারণ কেউ শুধুমাত্র তার সৎ কাজ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' সাহাবারা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনিও না?' তিনি বললেন, 'আমিও না। যদি আমার উপর আল্লাহ তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহ বর্ষণ না করেন।[১] আর মনে রেখো, ছোট হলেও যে ভালো কাজটি নিয়মিত করা হয় আল্লাহ সেটিকেই বেশি পছন্দ করেন।'[২] তবে আল্লাহর অনুগ্রহ নিঃশর্ত নয়। এটি বিশুদ্ধ ঈমান এবং ভালো কাজের উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

যে একটি সৎ কাজ করবে, সে তার দশগুণ বিনিময় পাবে। আবার যে একটি খারাপ কাজ করবে, তাকে শুধু সেটারই প্রতিফল দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।
(আল আন'আম, ৬:১৬০)

আল্লাহ যদি কঠোরভাবে মানুষের কাজের হিসাব নিতেন তাহলে কারও ভালো কাজই তার খারাপ কাজের চেয়ে বেশি হতো না। তাই আল্লাহ প্রতিটি ভালো কাজের মূল্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু খারাপ কাজগুলোর জন্য সেগুলোর সমপরিমাণ শাস্তিই নির্ধারণ করেছেন। এতে আল্লাহর অনুগ্রহই প্রকাশ পায়। আল্লাহর অনুগ্রহেই বিশ্বাসী মুসলিমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এতে মানুষের সৎ কাজের কোনো ভূমিকা নেই। মানুষের কৃতকর্মের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটাই জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারক নয়। আল্লাহর অনুগ্রহের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য।

একইভাবে, মানবজাতির সৃষ্টি, তাদের ভুল-ত্রুটি এবং ভালো কাজ—সবই আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলি যেমন: দয়া, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ প্রভৃতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করার বিভিন্ন অবস্থা।

---

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৭৩, নং ৬৭৬৫, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত।
[২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৪৭৩-৭৪, নং ৬৭৭০, 'আ'ইশাহ থেকে বর্ণিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর নিজ গুণাবলি প্রকাশের এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কোনো মানুষের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। কেননা, তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময়। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে যে, তিনি যে প্রক্রিয়ায় নিজ গুণাবলি প্রকাশ করেছেন সেটা নিশ্চয়ই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মানুষ তো শুধু ততটুকুই বুঝতে পারে যতটুকু আল্লাহ তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

তিনি যতটুকু চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তাঁরা আয়ত্ত করতে পারে না।

(আল বাকারা, ২:২৫৫)

তাই নিজেদের কখনোই কোনো ব্যাপারে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবা উচিত নয়। কোনো সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছেন—এটা যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে জানান তবে সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তটি কেন নিলেন—এমন প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এ রকম প্রশ্নের কোনো শেষ নেই; তাই এগুলো বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কিয়ামাতের দিনে মানুষকে তার নিয়্যাত এবং কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আল্লাহকে নয়। মহান আল্লাহ এই বিষয়ে বলেন,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং প্রশ্ন করা হবে তাদেরকেই।

(আল আম্বিয়া, ২১:২৩)

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করো, স্বয়ং আল্লাহর সত্ত্বার ব্যাপারে গবেষণা করতে যেও না।'[১] স্বয়ং আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা প্রকারান্তরে অসীম কোনো সত্তাকে নিয়ে চিন্তা করা। আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশ্বজগৎ এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছায়াপথ আর তারকারাজি নিয়ে চিন্তা করলেই মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আদি ও অনন্ত আল্লাহকে বোঝার চেষ্টা করলে মানুষ যে বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে তা বলাই বাহুল্য।

---

[১] আল হিলায়াহ গ্রন্থে আবু নু'আইম কর্তৃক সংগৃহীত, সিলসিলাহ আল আহাদিস আস-সাহিহাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ১২, নং ১৭৮৮। আল আওসাত গ্রন্থে আত-তাবারানী এবং শু'আব আল ঈমান গ্রন্থে আল বায়হাকি অনুরূপ একটি বর্ণনা ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উত্তর নেই এমন প্রশ্ন করে শয়তান আল্লাহর ব্যাপারে বিশ্বাসীদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়ে নবী ﷺ আমাদের সতর্ক করেছেন। আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'শয়তান সবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করবে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? তারপর এক পর্যায়ে সে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে?' এই প্রশ্ন মনে আসা মাত্রই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে (বলতে হবে: আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।)[১] এবং এ ধরনের চিন্তা এড়িয়ে যেতে হবে।'[২]

সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিষয়টি একেক গ্রন্থে একেকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাইবেলের সামগ্রিক পর্যালোচনা একজন নিষ্ঠাবান সত্যান্বেষীকে সত্যের সন্ধান না দিয়ে বরং তাকে আরও জটিল এক গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টে আগের যুগের মানুষ এবং ইহুদিদের ইতিহাস ও আইনই প্রাধান্য পেয়েছে।[৩]

খ্রিষ্টানদের অধিকাংশ উপদলের অনুসারীরা সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে যে-অভিন্ন বিশ্বাস পোষণ করে তা হলো, আদম এবং তার সব সন্তানদের পাপ মোচন করতে সৃষ্টিকর্তা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসে মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মতে এই পাপ এতই ভয়াবহ ছিল যে, কোনো মানবীয় প্রায়শ্চিত্ত এটিকে মোচন করতে পারত না। স্রষ্টা এত বেশি উঁচু মর্যাদাবান যে, কোনো পাপী ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না। তাই শুধুমাত্র স্রষ্টার নিজের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই মানবজাতিকে এই পাপ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব।

চার্চের দাবি অনুযায়ী, মানুষের মনগড়া এই পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাস স্থাপনই পাপ মোচনের একমাত্র উপায়। ফলে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের ব্যাপারে খ্রিষ্টীয় মতবাদ দাঁড়ায় 'স্রষ্টার

---

[১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭, নং ২৪২ ও ২৪৩।

[২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ. ৭৭, নং ২৪৪ এবং সহীহ আল বুখারি, খণ্ড ৪, পৃ. ৩২০, নং ৪৯৬।

[৩] ইসাইয়াহতে বলা হয়েছে, ইহুদিদের সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের মহিমাস্বরূপ 'কিন্তু যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে আকৃতি দিয়েছেন সেই প্রভু বলছেন, হে জ্যাকব, হে ইসরাইল,...'' আমি উত্তর দিককে বলব ছেড়ে দাও, দক্ষিণকে বলব, ধরে রেখো না। পৃথিবীর দূরদূরান্ত থেকে আমার পুত্র এবং কন্যাদের এনে দাও। যাদের আমার নামে ডাকা হয়, যাদের আমি আমার মহিমার নিদর্শনস্বরূপ সৃষ্টি করেছি, যাদের আমি তৈরি করেছি এবং আকৃতি দান করেছি।''(রিভাইজ্ড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন, ইসাইয়াহ ৪৩:১, ৬–৭)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আত্মত্যাগ' কে বিশ্বাস করা এবং যিশু খ্রিষ্টকে প্রভু ও প্রতিপালক হিসাবে মেনে নেওয়া। জনের গসপেলে যিশুর বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, 'ঈশ্বর পৃথিবীকে এতই ভালোবাসেন যে, এর জন্য তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে সেখানে পাঠান এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে।' [১]

হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের সংখ্যা অনেক, ঈশ্বরের অবতার রয়েছে, ঈশ্বরের মানবরূপ রয়েছে এবং সবকিছুই ঈশ্বর বা ব্রহ্মা। সব জীবিত সত্তাই ব্রহ্মা—এমন বিশ্বাসের দাবি করা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে চরম অমানবিক একটি বর্ণপ্রথা গড়ে উঠেছে। এই বর্ণপ্রথায় পুরোহিতদের বর্ণ এবং ব্রাহ্মণগোত্র জন্মসূত্রে আধ্যাত্মিক প্রাধান্য লাভের সুবিধা ভোগ করে। এরা বেদ[২] শিক্ষা দেয় এবং সামাজিক মর্যাদা ও প্রথাসমূহের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। অপরপক্ষে, শূদ্র বর্ণের কোনো ধর্মীয় মর্যাদা নেই এবং তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে অন্য তিনটি বর্ণ এবং সেগুলোর হাজারো উপবর্ণের লোকদের 'বিনয়ের সাথে সেবা করা।' [৩]

অদ্বৈতবাদী হিন্দু দার্শনিকদের মতে, মানবজাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নিজ ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করা এবং একটি পথ (মার্গ) অনুসরণের মাধ্যমে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তিলাভ বা মোক্ষ অর্জন করা। আর এর মাধ্যমেই মহা সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে মানবাত্মার পুনর্মিলন ঘটবে। ভক্তি পথের[৪] অনুসারীদের মতে সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। কারণ, তাদের মতে ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন 'মানবীয় সম্পর্কগুলোকে ভালোবাসার জন্য—যেমনিভাবে বাবা তার সন্তানদের ভালোবাসেন' (শ্রীমদ ভাগওয়াতাম)। আর অন্যান্য সাধারণ হিন্দুদের পথ হচ্ছে কর্ম পথ।[৫] এই পথের

---

[১] জন, ৩:১৬ *(রিভাইজ্ড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন)।*

[২] বেদ (যার আভিধানিক অর্থ জ্ঞান) হচ্ছে হিন্দুদের ধারণামতে তাদের ধর্মের পবিত্র ঐশী গ্রন্থসমূহকে (এগুলোকে বলা হয় শ্রুতি) একত্রে বোঝাতে ব্যবহৃত একটি সামষ্টিক শব্দ। হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান বর্ণনাকারী অন্যান্য যে গ্রন্থগুলোকে মানবরচিত বলে স্বীকার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় স্মৃতি (যা মনে রাখা হয়)। (*দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়া,* খণ্ড ২০, পৃ. ৫৩)।

[৩] মানব ধর্মশাস্ত্র ১.৯১ (*দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়া,* খণ্ড ২০, পৃ. ৫৫৩)।

[৪] মূর্তিপূজার মাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে পরবর্তী জীবনে কৃষ্ণালোকে (একটি আধ্যাত্মিক জগৎ) যাওয়ার আশা করা।

[৫] *দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিয়া,* খণ্ড ২০, পৃ. ৫২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুসারীদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা এবং নিজ নিজ বর্ণ অনুযায়ী ধর্মীয় প্রথাসমূহ পালন করা।

সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ কুরআনে মহান আল্লাহ মানবজাতি সৃষ্টির পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। এবং তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য করে সবকিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন।

'আল্লাহ কেন মানুষ সৃষ্টি করলেন?' মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নটির অর্থ দাঁড়ায় এ রকম: 'কী উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে?' মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কোনো রকম অস্পষ্টতা ছাড়াই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রথমেই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে সহজাত সচেতনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা আল আ'রাফ-এ আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ — أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ
قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

আর যখন তোমার প্রভু আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বললেন (এই বলে যে), "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।" এটা এজন্য যে, তোমরা যেন পুনরুত্থানের দিন না বলো, "আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।" অথবা যেন না বলো, "আমাদের বাপ-দাদারাই তো আগে শির্ক করেছে; আর আমরা হলাম তাদেরই পরবর্তী বংশধর। অতএব, আপনি কি বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবেন।"
(আল আ'রাফ, ৭:১৭২–১৭৩)

তাই প্রতিটি মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। কারণ আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর উপর সহজাত এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই কুরআনে আল্লাহ মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর জিন[১] ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা শুধু আমার ইবাদাত করবে। (আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

সুতরাং, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত করা। তবে মানুষের ইবাদাতের কোনো প্রয়োজন সর্বশক্তিমান আল্লাহর নেই। অর্থাৎ, তিনি তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন মেটাতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেননি। একটি মানুষও যদি আল্লাহর ইবাদাত না করে তাতে তাঁর মহিমা কোনো অংশে কমবে না। একইভাবে সমগ্র মানবজাতি যদি আল্লাহর ইবাদাত করে তাতেও তাঁর মহিমা কোনো অংশে বৃদ্ধি পাবে না। আল্লাহ সব ত্রুটি ও মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত। একমাত্র তিনিই সব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। সব সৃষ্ট সত্তারই কিছু না কিছু প্রয়োজন রয়েছে। তাই আল্লাহর ইবাদাত করাটা প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির নিজেদের কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন।

আল্লাহর ইবাদাহ করা কেন মানুষের জন্য আবশ্যকীয় তা বুঝতে হলে প্রথমে 'ইবাদাহ' বা ইংরেজিতে worship শব্দটি ভালোভাবে বুঝতে হবে। 'Worship' শব্দটি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ *weorthscipe* থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ সম্মান (honor)। ইংরেজি ভাষায় worship শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: 'কোনো উপাস্যের প্রতি সম্মানবশত ভক্তিমূলক কোনো কাজ সম্পাদন করা।'[২] এই অর্থ অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

আপনি আপনার প্রভুর কৃতজ্ঞতাসহ মহিমা ঘোষণা করুন। (আন-নাস্‌র, ১১০:৩)

আল্লাহর উপাসনার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টিজগতের সবার সাথে একই ঐকতানে চলে আসে। কারণ অন্যান্য সব সৃষ্টি প্রাকৃতিকভাবেই আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। আল্লাহ কুরআনের অনেক সূরাতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সূরা আল ইসরাতে তিনি বলেন,

---

[১] জিন হচ্ছে আগুনের উপাদান থেকে আল্লাহর সৃষ্ট এক প্রকার যুক্তিবোধ সম্পন্ন অদৃশ্য সত্তা। আল্লাহ মানুষের মতো তাদেরকেও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। তাই তাদের মাঝেও ভালো-খারাপ এবং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী রয়েছে। তাদের খারাপদের সাধারণত প্রেতাত্মা, ভূত, শয়তান ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

[২] *দি লিভিং ওয়েবস্টার এনসাইক্লোপেডিক ডিকশনারি*, পৃ. ১১৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর কৃতজ্ঞতাসহ মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তার সকৃতজ্ঞ মহিমা ঘোষণা করে না।[১] তবে তোমরা তাদের বর্ণণার ভাষা বুঝতে পারো না। (আল ইসরা, ১৭:৪৪)

আরবিতে উপাসনাকে বলা হয় *'ইবাদাহ*। এটি *'আবিদ* বিশেষ্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত যার অর্থ 'দাস'। একজন দাস তার প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। একইভাবে কুরআন অনুযায়ী *'ইবাদাহ* বলতে বোঝায় 'আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি অনুগত আত্মসমর্পণ

আল্লাহ মানবজাতির কাছে যত বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলেন, তাদের মূল বার্তার সারকথা ছিল এটাই। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাথিউর গসপেল ৭:২১ অনুযায়ী, উপাসনার এই অর্থের প্রতি নবী ঈসা ﷺ জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমাকে যারা *প্রভু* বলে ডাকে তাদের কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু তারাই প্রবেশ করবে যারা আমার পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী চলে যিনি রয়েছেন আকাশের উপর।' তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এখানে 'ইচ্ছা' বলতে 'আল্লাহ মানুষকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন' তা বোঝায়; 'আল্লাহ মানুষকে যা করার স্বাধীনতা দিয়েছেন' তা নয়। কারণ এই সৃষ্টজগতে কোনো কিছুই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঘটে না। ঐশী বাণীর মাঝেই 'আল্লাহর ইচ্ছা' বর্ণনা করা হয়েছে যা নবী-রাসূলগণ তাঁদের অনুসারীদের শিখিয়ে গেছেন। ফলে ঐশী বিধানের প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে উপাসনার মূল ভিত্তি। তাই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করলে আল্লাহর প্রশংসা করাটাও ইবাদাতে পরিণত হয়।

মানুষকে কেন স্রষ্টার ইবাদাহ করতে হবে? কেন ঐশী বিধান মেনে চলতে হবে? কারণ এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনে সাফল্য লাভের একমাত্র চাবিকাঠিই এই ইবাদাত। প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া ﷺ -কে সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে জান্নাত থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়। মানুষের জন্য জান্নাতে ফিরে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই বিধানের প্রতি অনুগত হওয়া।

---

[১] কুরআনে যথাক্রমে ১৩:১৩, ২১:২০ ও ৩৮:১৮ তে বলা হয়েছে বজ্রপাত, রাত-দিন এবং পাহাড়সমূহ আল্লাহর প্রশংসা করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ম্যাথিউর গসপেলে বর্ণিত আছে যে, মসীহ ঈসা ﷺ আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যকে জান্নাতের চাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে রয়েছে যে, একজন এসে তাঁকে বলল, 'হে মহান শিক্ষক, অনন্ত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে কী কী ভালো কাজ করতে হবে?' তখন যিশু তাকে বললেন, 'তুমি আমাকে মহান বলছ কেন? আল্লাহ ছাড়া কেউ মহান নয়। তুমি যদি সেই জীবনে প্রবেশ করতে চাও তাহলে আল্লাহর আদেশ পালন করো।'[১] ম্যাথিউর ৫:১৯ এ বলা হয়েছে যে, যিশু খ্রিষ্ট আল্লাহর বিধান কঠোরভাবে মেনে চলার উপর জোর দিয়ে বলেন, যদি কেউ এই নির্দেশগুলোর কোনো একটি ভঙ্গ করে এবং মানুষকে ভঙ্গ করতে শেখায় তবে তাকে পরকালে অপমানিত করা হবে; আর যারা সেগুলো পালন করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেবে তাদেরকে পরকালে সম্মানিত করা হবে।

[১] ম্যাথিউ ১৯:১৬-১৭ (রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ব্রাজিলের অ্যামাজন জঙ্গালের আদিম উপজাতিদের একদল মানুষ আছে যারা স্কোয়াচ নামক মূর্তির পূজা করে। একটি কুঁড়েঘরে স্কোয়াচের মানুষরূপী মূর্তিটা বসানো ছিল। স্রষ্টাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য এক যুবক যখন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মূর্তির সামনে সিজদা করছিল, তখন কুঁড়েঘরের ভেতর একটি নেড়ি কুকুর চুপিসারে ঢুকে পড়ে। লোকটা সিজদা শেষ করে মাথা ওঠাতেই দেখল, একটি কুকুর মূর্তিটার উপর মূত্রত্যাগ করছে। অপমানের জ্বালায় দগ্ধ সেই যুবক বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করে ফিরল কুকুরটাকে। ক্রোধ কিছুটা কমে আসার পর সে শান্ত হয়ে বসল। হঠাৎ তার মনে এই বোধোদয় হলো যে, এই মূর্তি কখনোই মহাবিশ্বের প্রভু হতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্রষ্টা

নিজের মনের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করে সে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে, এই মূর্তি তার স্রষ্টা নয়; স্রষ্টা নিশ্চয়ই অন্য কেউ। শুনতে যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন, এই যুবকের জন্য এটাই ছিল স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিদর্শন। জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্রষ্টা মানুষকে তাঁর বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে তিনি মানুষকে তাঁর নিদর্শন দেখান। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে তিনি এই ইঙ্গিত দেন যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে, স্রষ্টা একজনই এবং তিনি এক ও একক আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে, সব মানুষ কীভাবে কেবল একজন স্রষ্টাকে বিশ্বাস করবে, যেহেতু একেক মানুষ একেক পরিবেশে, সমাজে, সংস্কৃতিতে বসবাস করে? স্রষ্টার ব্যাপারে সে যদি কিছু না-ই জানে, স্রষ্টার জ্ঞান যদি তাকে দেওয়া না হয় তাহলে সে কীভাবে তাঁর উপাসনা করবে। সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে যে, একক স্রষ্টাকে বিশ্বাস করাই মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্বাসই গেঁথে দেওয়া হয়েছে মানুষের অন্তরে।

মানবজাতির একটি বড় অংশ সর্বদাই স্রষ্টায় বিশ্বাস করে এসেছে। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান আধুনিক সমাজ পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই স্রষ্টাকেন্দ্রিক ধর্মগুলো মানবসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। বাস্তবে দেখা যায়, বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত স্রষ্টায় অবিশ্বাস বা নাস্তিক্যবাদ খুব অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি বর্তমানেও যখন পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজগুলোতে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা ডারউইনীয় তত্ত্ব দিয়ে স্রষ্টাকে নিছক মনুষ্য কল্পনার ফসল হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যস্ত তখনো নিরক্ষর থেকে বিজ্ঞানী পর্যন্ত মানুষের একটি বড় অংশ স্রষ্টায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

ফলাফলস্বরূপ, স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রচুরসংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাত্ত থেকে কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছেন যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস অবশ্যই একটি জন্মগত ব্যাপার; এটা শিখিয়ে দেওয়া কিছু নয়। সমাজবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই এর বিপরীত সিদ্ধান্ত দিলেও সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 'আস্তিক্যবাদ'-কে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বলেই প্রমাণ করে। "God Spot is found in the Brain" শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ভিলাইয়ানুর রামচন্দ্রন বলেছেন যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনে প্রোথিত।

ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের জন্মগত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ থাকলেও বিভিন্ন সমাজে স্রষ্টায় বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে অনেক আস্তিকও শেষ পর্যন্ত এমন ধারণা পোষণ করতে শুরু করেন যে, সকল ধর্ম মনুষ্যসৃষ্ট। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে; আর তা হলো বিভিন্ন উপাস্যের উপর এক চূড়ান্ত সত্তায় বিশ্বাস। এটি একত্ববাদের এমন এক ভিত্তি যা সর্বেশ্বরবাদী ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুধর্মের মধ্যে স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা হলো, মানবজাতি প্রথমে একত্ববাদী ছিল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মস্তিষ্কে God Spot-এর সন্ধান লাভ

স্টিভ কনর | বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদক

(দ্য সানডে টাইমস, ২ নভেম্বর ১৯৯৭)

বিজ্ঞানীদের দাবি তাঁরা মানুষের মস্তিষ্কে God Module নামে একটি জায়গা আবিষ্কার করেছেন যা মানুষের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপনের পিছনে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

স্নায়ুতান্ত্রিক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রচুর আধ্যাত্মিক চর্চা করেন তাদের মস্তিষ্কের সামনের অংশে কিছু স্নায়ু সংযোগ রয়েছে এবং যখন তারা স্রষ্টাকে নিয়ে চিন্তা করেন তখন এই স্নায়ুগুলো বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এই গবেষণা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ফলাফল এটাই প্রমাণ করে যে, ধর্মে বিশ্বাস মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য।

এপিলেপ্সির যেসব রোগী মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের 'সিজার' সমস্যায় ভোগেন তারা জানিয়েছেন, তারা প্রায়ই ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল নিউরোসায়েন্টিস্ট এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেন, 'সিজার' এর ফলে মস্তিষ্কের একটি অংশের স্নায়ুতে অতিরিক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং এই অংশের নাম তারা দিয়েছেন God Module.

"মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবে কিছু স্নায়ুকোষ থাকতে পারে যেগুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোই বিবর্তিত হয়ে সমাজে ক্রম এবং স্থায়িত্ব আরোপ করতে পারে।"— গত সপ্তাহে এক সম্মেলনে গবেষকদল একথা জানিয়েছেন।

এসব ফলাফল ইঙ্গিত দেয়, যেকোনো ব্যক্তি ধর্ম—এমনকি কোনো স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন কি না তা নির্ভর করতে পারে মস্তিষ্কের এই অংশের স্নায়ু সংযোগের গঠন প্রকৃতির উপর।

গবেষক দলের প্রধান ড. ভিলাইয়ানুর রাম চন্দ্রন জানান, তারা তাদের গবেষণায় এপিলেপ্সি আক্রান্ত রোগীদের সাথে একদল সাধারণ মানুষের এবং একদল কট্টর ধার্মিক মানুষের তুলনা করেছেন।

মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের এক কার্যকর পরীক্ষায় দেখা গেছে, যখন আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংক্রান্ত কথা বলা হয় তখন এপিলেপ্সি আক্রান্ত রোগী এবং কট্টর ধার্মিক মানুষের মস্তিষ্কে একই ধরনের উদ্দীপনা পাওয়া যায়।

বিবর্তন বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সারা বিশ্বে এবং সমগ্র ইতিহাসের মানব সমাজে স্রষ্টায় বিশ্বাসের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা ডারউইনীয় অভিযোজন হিসেবে মস্তিষ্কের জটিল স্নায়ুসংযোগে সংস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে, যাতে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

যদি এই গবেষণা সত্য হয় এবং God Module বলে সত্যিই কিছু থেকে থাকে তাহলে প্রমাণিত হয়, নাস্তিকদের মস্তিষ্কের স্নায়ুসংযোগ অন্যদের চেয়ে আলাদা।

অক্সফোর্ডে বিশপ রিচার্ড হ্যারিসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, God Module এর অস্তিত্ব ধর্মতাত্ত্বিকদের নয়; বরং বিজ্ঞানীদের আলোচনার বিষয়। "যদি স্রষ্টা আমাদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্মগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেন তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।"

এবং ধীরে ধীরে অধঃপতনের ফলে বহু ঈশ্বরবাদী হয়ে পড়ে। বহু উপাস্য এবং প্রতিমা থাকার পরও সবার উপর হিন্দুধর্মের একজন চূড়ান্ত সত্তা রয়েছে যাকে তারা বলে ব্রহ্মা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথাগতভাবে, অনেক নৃতাত্ত্বিকের মতে ধর্ম বহু ঈশ্বরবাদ থেকে ধাপে ধাপে একেশ্বরবাদের দিকে ধাবিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার প্রথমদিকে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করত এবং এর ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে সব অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দুইটি প্রধান দেবতা (একজন 'মঙ্গল'-এর দেবতা ও অপরজন 'অমঙ্গল'-এর দেবতা) হিসেবে কল্পনা করে এবং শেষ পর্যন্ত একেশ্বরবাদের ধারণায় উপনীত হয়।

সুতরাং নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ধর্ম কোনো স্বর্গীয় উৎস থেকে আসেনি বরং তা আদিম মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবপ্রসূত কুসংস্কারের ফসল মাত্র। এসব তাত্ত্বিকগণের মতে, বিজ্ঞান একসময় প্রকৃতির সব ঘটনার গোপন রহস্য উন্মোচন করে ধর্মকে অকার্যকর প্রমাণ করবে এবং তার সাথে সাথে ধর্মেরও বিলুপ্তি ঘটবে।

অথচ এক চূড়ান্ত সত্তায় বিশ্বাসের উপর মানুষের যে-জন্মগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা উপরোক্ত মতের বিপরীত মতকেই সমর্থন করে। আর তা হলো, মানুষ শুরুতে একত্ববাদের উপরেই ছিল; কিন্তু কালের বিবর্তনে বহু ঈশ্বরবাদী হয়ে পড়ে। যেসব তথাকথিত আদিম গোত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মাঝেও একজন চূড়ান্ত সত্তায় বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। এসব আবিষ্কারের সময় তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বিবর্তনের যে ধাপেই থাকুক না কেন তাদের অধিকাংশই সব উপাস্য ও আত্মার উপর এক চূড়ান্ত সত্তায় বিশ্বাস করত বলে প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ ধর্মেই এক চূড়ান্ত সত্তার ধারণা এটাই প্রমাণ করে যে, মানবীয় মাত্রায় হলেও স্রষ্টার কিছু গুণাবলি সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান থাকার কারণে বেশিরভাগ মানুষ একত্ববাদ থেকে দূরে সরে যায়, ফলে সেসব সৃষ্টি কিছু ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্রতর স্রষ্টা'য় এবং কিছু ক্ষেত্রে সুপারিশকারীতে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে একজন চূড়ান্ত সত্তায় বিশ্বাস—তা যেমনই হোক না কেন।

আল কুরআনে স্রষ্টা বলেছেন যে, তিনি যখন আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করলেন, তখন কিয়ামাত পর্যন্ত আদমের যত বংশধর আসবে, তাদের সবাইকে উপস্থিত করে এই অঙ্গীকার নিলেন যে,

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا

'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' এর উত্তরে সবাই বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ এরপর তাদের ব্যাখ্যা করলেন, তিনি কেন সব মানুষের কাছ থেকে এই সাক্ষ্য নিলেন যে, তিনিই তাদের স্রষ্টা: তিনিই উপাসনা লাভের অধিকারী একমাত্র প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি বলেছেন,

أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ

এটা এজন্য যে, তোমরা যেন পুনরুত্থানের দিন একথা না বলো, 'আমরা এই ব্যাপারে কিছুই জানতাম না।' (আল আ'রাফ, ৭:১৭২)

অর্থাৎ সেদিন আমরা একথা বলে পার পাবো না যে, আল্লাহ যে আমাদের স্রষ্টা সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। কেউ আমাদের এটা বলেওনি যে, শুধু আল্লাহকেই আমাদের উপাসনা করতে হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ এই বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

অথবা যেন এটা বলতে না পারো, "আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আগে শির্ক করেছে; আর আমরা হলাম তাদেরই বংশধর। আপনি কি এসব বাতিলপন্থীদের কাজের জন্য আমাদের ধ্বংস করে দিবেন?" (আল আ'রাফ, ৭:১৭৩)

প্রতিটি শিশুই তাই স্রষ্টার প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস এবং কেবল তাঁকেই উপাসনা করার জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। জন্মগত এই বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যকে আরবিতে বলা হয় "ফিত্‌রাহ"।

নবী ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, 'সঠিক ধর্মের উপরই আমি আমার দাসদের সৃষ্টি করেছি। যদিও শয়তান তাদের অনেককে বিপথে নিয়ে গেছে।' নবী ﷺ আরও বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশুই ফিত্‌রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা জরুথুস্ট্রি বানায়।' শিশুটিকে যদি একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে তার নিজের মতো করে স্রষ্টার উপাসনা করবে। কিন্তু প্রত্যেক শিশুই তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুটি যেভাবে প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়, ঠিক তেমনি তার অন্তর প্রাকৃতিকভাবেই সায় দেয় যে, একমাত্র আল্লাহই তার প্রভু, তার সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তার বাবা-মা যদি তাকে ভিন্ন কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পথে চালানোর চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে জীবনের প্রথমদিকে শিশুটি তার বাবা-মা'র সেই ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে পারে না। পারে না বাধা দিতে। ফলে শিশুটি তখন স্থানীয় রীতিনীতি ও শৈশবের শিক্ষাদীক্ষার মাঝে বেড়ে উঠতে শুরু করে। তবে একটি নির্দিষ্ট বয়স পার হওয়ার আগপর্যন্ত স্রষ্টা এই ধর্ম পালন করার জন্য তাকে দায়ী করবেন না, তাকে শাস্তিও দেবেন না।

এছাড়াও জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্রষ্টা মানুষকে তাঁর বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে তিনি মানুষকে তাঁর নিদর্শন দেখান। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে তিনি এই ইঙ্গিত দেন যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে, স্রষ্টা একজনই এবং তিনি এক ও একক আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন,

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(পৃথিবীর) দিক-দিগন্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব, যতক্ষণ না এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি সত্য। (ফুসসিলাত, ৪১:৫৩)

বিভিন্ন ইঙ্গিত ও নিদর্শন দেখানোর মাধ্যমে স্রষ্টা কীভাবে মানুষকে তার ভুল শুধরে দেন, এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ব্রাজিলের অ্যামাজন জঙ্গলের আদিম উপজাতিদের একদল মানুষ স্কোয়াচ নামক মূর্তির পূজা করে। তাদের বিশ্বাস সব সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্রষ্টা স্কোয়াচ। একটি কুঁড়েঘরে স্কোয়াচের মানুষরূপী মূর্তিটা বসানো ছিল। স্রষ্টাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য এক যুবক একদিন সেই ঘরে ঢোকে। তাকে শেখানো হয়েছিল এই মূর্তিই তার স্রষ্টা, তার পালনকর্তা। সে যখন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মূর্তির সামনে সিজদা করছিল, তখন কুঁড়েঘরের ভেতর একটি নেড়ি কুকুর চুপিসারে ঢুকে পড়ল। লোকটা সিজদা শেষ করে মাথা ওঠাতেই দেখল, একটি কুকুর মূর্তিটার উপর মূত্রত্যাগ করছে।

সে এটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারল না। কুকুরটাকে ধরার জন্য সে উঠে দাঁড়াল। এই ফাঁকে কুকুরটাও ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়। অপমানের জ্বালায় দগ্ধ সেই যুবক বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করে ফিরল কুকুরটাকে। ক্রোধ কিছুটা কমে আসার পর সে শান্ত হয়ে বসল। হঠাৎ তার মনে এই বোধোদয় হলো যে, এই মূর্তি কখনোই মহাবিশ্বের প্রভু হতে পারে না। নিজের মনের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করে সে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই মূর্তি তার স্রষ্টা নয়; স্রষ্টা নিশ্চয়ই অন্য কেউ। শুনতে যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন, এই যুবকের জন্য এটাই ছিল স্রষ্টার পক্ষ থেকে নিদর্শন। এই নিদর্শন তাকে সেই ঐশীবার্তাই দিয়েছে যে, সে যার উপাসনা করছে সেটা মিথ্যে। প্রথাগতভাবে মিথ্যা উপাস্য পূজোর যে শৃঙ্খলে সে বন্দি ছিল, এই ঘটনা তাকে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাকে দুটো পথের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে: প্রকৃত স্রষ্টাকে অন্বেষণ করা অথবা ভুল পথেই রয়ে যাওয়া।

স্রষ্টার নিদর্শন যারা খুঁজে ফিরবে তারাই সঠিক পথের দিশা পাবে। যেমনটা পেয়েছিলেন নবী ইবরাহীম ﷺ। তাঁর ঘটনা তুলে ধরে কুরআনে বলা হয়েছে,

"আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে থাকি, যাতে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। যখন রাতের অন্ধকার নামে সে তখন একটি তারকা দেখতে পায়। সে বলে, 'এই তো আমার প্রভু।' কিন্তু যখন সেটা ডুবে যায় তখন বলে, 'যারা ডুবে যায় আমি তাদের পছন্দ করি না।' তারপর যখন উদীয়মান চাঁদ দেখতে পায় তখন বলে, 'এই আমার প্রভু।' কিন্তু যখন তা-ও ডুবে যায় তখন বলে, 'আমার প্রভু যদি আমাকে পথ না দেখান তাহলে আমি অবশ্যই পথহারা লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব।' এরপর যখন উদীয়মান সূর্য দেখে তখন বলে, 'এটাই আমার প্রভু হবে, (কারণ) এটা আরও বড়।' কিন্তু যখন তা-ও ডুবে গেল তখন বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর সাথে যাকে শরিক করো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একনিষ্ঠ হয়ে সেই মহান সত্তার দিকে আমার মুখ ফেরালাম যিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; যারা তাঁর সাথে শরিক করে আমি তাদের দলে নই।'"

(আল আন'আম, ৬: ৭৫-৭৯)

স্রষ্টার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত বিশ্বাস এবং তাঁর উপাসনা করার জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর কাছেই নবীদের পাঠানো হয়েছে। এই শাশ্বত সত্যকে আরও দৃঢ় করার জন্য স্রষ্টা মানুষকে তাঁর বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়েছেন। যদিও এসব নবীগণ যা প্রচার করেছিলেন তার অনেক কিছুই আজ বিকৃত হয়ে গেছে, এরপরও এসবের মধ্যে এখনো বেশ কিছু কথা অবিকৃত রয়ে গেছে। সত্যানুসন্ধানীরা এগুলোর সূত্র ধরে ঠিকই সত্য ও ভুল পথের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে আইন ও শাসন ব্যবস্থায় স্রষ্টার প্রত্যাদেশের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহুদিদের তাওরাতে 'মুসার দশ অনুশাসন' নামে পরিচিত যে বিধিবিধান ছিল, পরবর্তীকালে সেটাই খ্রিষ্টানদের ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও আধুনিক ও প্রাচীন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুগের বিভিন্ন সমাজে হত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের জন্য যেসব আইন রয়েছে, সেগুলোতেও এই দশ অনুশাসনের বেশ প্রভাব পাওয়া যায়।

যুগ যুগ ধরে নবীদের প্রতি অবতীর্ণ ওহী এবং মানবজাতির প্রতি স্রষ্টার বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীর সব মানুষকেই প্রকৃত ও একমাত্র স্রষ্টাকে চেনার পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, মানুষ তার স্রষ্টার প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনয়ন করেছে কি না এবং তাঁর মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করেছে কি না, এ ব্যাপারে সবাইকেই জবাবদিহি করতে হবে।

সৃষ্টিকে যখন স্রষ্টা মনে করা হয়

স্রষ্টায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক মানুষের মধ্যে এমন একটি অযৌক্তিক ধারণা বাসা বেঁধে আছে যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়; আর তা হলো স্রষ্টা মানুষে পরিণত হন বলে মনে করা। যখনই স্রষ্টায় বিশ্বাসের প্রাচীন একত্ববাদী ধারণার অধঃপতন ঘটে এই ভেবে যে, স্রষ্টার কাছে মানুষের আবেদন জানাতে কিংবা পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার জন্য স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে একটি মাধ্যম দরকার; তখনই ওইসব কাল্পনিক মাধ্যমগুলো ইবাদাতের বস্তুতে পরিণত হয়। এই মাধ্যমগুলোকে কখনো কখনো প্রকৃতিতে বিদ্যমান সত্তা হিসেবেও কল্পনা করা হয়।

এসব কারণে আদিমকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পথভ্রষ্ট মানুষ বন, নদী, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির উপাসনা করে আসছে। কখনো কখনো খোদ প্রকৃতিরই উপাসনা করেছে। আবার, কখনো প্রকৃতিকে উপস্থাপনকারী নানাবিধ প্রতীক উপাসনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের বিশ্বাস থেকে যেসব ধর্মীয় ব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছে সেগুলো আদিমকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন মানুষের মাঝে সীমিত ও বিক্ষিপ্তভাবে রয়ে গেছে। বর্তমান ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, এসব বিশ্বাস কখনো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী একটি মৌলিক বিশ্বাসে রূপ নিতে পারেনি।।

অন্যদিকে, যেখানেই একত্ববাদী বিশ্বাস থেকে ক্রমান্বয়ে স্রষ্টার ক্ষমতাকে পৃথক মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এজন্য ছবি-মূর্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেই ঐসব ছবি-মূর্তি উপাসনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। স্রষ্টার ক্ষমতাই উপাস্যে রূপ নিয়েছে। এই ধরনের বিশ্বাস প্রাচীন ও বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক প্রভাবসম্পন্ন ধর্মবিশ্বাসগুলোর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শীর্ষে অবস্থান করছে। খ্রিষ্টানরা প্রাচীন মিশর, গ্রিক ও রোম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে। এর ফলে সেসব স্থানের ধর্মগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপরেও মুসলিম ও খ্রিষ্টান উপনিবেশগুলোতে হিন্দুধর্মের ভারতীয় দর্শন এখনো টিকে আছে এবং সেখানকার প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়েছে। একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার বালি ছাড়া দূর প্রাচ্যের অধিকাংশ জায়গায় খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম সরাসরি আন্তর্জাতিক প্রভাব স্থাপন করলেও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন রূপ ও তার শাখা-প্রাশাখাগুলো সেখানে কোটি কোটি মানুষের প্রধান ধর্মে রূপ নিয়েছে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনও বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করছে।

হিন্দুধর্মের মূলনীতি অনুযায়ী সবকিছুই স্রষ্টা; সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। হিন্দু দর্শন অনুযায়ী, প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুরই একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যার নাম—'আত্মা'। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় এই অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রকৃত স্রষ্টা যার নাম—'ব্রহ্মা'। এ কারণে হিন্দুধর্মের বিশ্বাসের সারাংশ হলো: 'আত্মা এবং ব্রহ্মা এক ও অবিচ্ছেদ্য'; অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের আত্মা স্বর্গীয়। অধিকন্তু, মানবসমাজ কতগুলো জাতিপ্রথা কিংবা শ্রেণিপ্রথায় বিভক্ত এবং মনে করা হয়, বিভিন্ন শ্রেণি স্বর্গীয় সত্তা 'ব্রহ্মা'র বিভিন্ন অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণি 'ব্রাহ্মণ' এসেছে স্রষ্টার মাথা থেকে, আবার সর্বনিম্ন শ্রেণি 'শূদ্র' এসেছে স্রষ্টার পা থেকে। রীতি অনুযায়ী চারটি প্রধান শ্রেণি থাকলেও বাস্তবে এর আবার অনেকগুলো উপশ্রেণি রয়েছে। প্রতিটি প্রধান শ্রেণি আবার হাজারো ক্ষুদ্রতর শ্রেণিতে বিভক্ত।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির আত্মা কখনো মারা যায় না বরং ক্রমাগতভাবে পুনর্জন্ম নিতে থাকে। কেউ যদি প্রথম জীবনে ভালো হয়ে থাকে তবে পরবর্তীতে সে উচ্চতর শ্রেণিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে। বিপরীতভাবে, কেউ যদি প্রথম জীবনে খারাপ হয়ে থাকে তবে পরবর্তীকালে সে নিম্নতর শ্রেণিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে। আর মূলত এ কারণেই প্রতি বছর অসংখ্য হিন্দু আত্মহত্যা করে থাকে। সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিন বাসায় ফ্যানের সাথে ঝুলে আত্মহত্যার খবর প্রকাশ করছে। একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, ক্রিকেট ম্যাচে ভারত শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে গেলে এক হিন্দু আত্মহত্যা করে। আসলে যখন কারও ধর্মীয় বিশ্বাস 'পুনর্জন্ম' মতবাদকে সমর্থন করে, তখন তার অনুসারীদের কাছে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা 'খুব সহজ' সমাধান হয়ে দাঁড়ায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পুর্নজন্ম প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ শ্রেণিতে জন্ম নেয় তখন তার চক্র শেষ হয় এবং এই অবস্থায় সে 'ব্রহ্মা'র সাথে মিলিত হয়। এই মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে হিন্দু ধর্মে বলা হয় 'মোক্ষ' এবং বৌদ্ধধর্মে বলা হয় 'নির্বাণ'।[১] এভাবে 'আত্মা' পুনরায় 'ব্রহ্মা'র সাথে মিলিত হয় এবং মানুষ স্রষ্টায় পরিণত হয়।

হিন্দুধর্মে 'ব্রহ্মা'র গুণাবলি বিভিন্ন উপাস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সৃষ্টির গুণাবলি পরিণত হয় 'ব্রহ্মা'য়, রক্ষণাবেক্ষণের গুণাবলি পরিণত হয় 'বিষ্ণু'-তে, ধ্বংসের ক্ষমতা পরিণত হয় 'শিব'-এ। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপাস্য 'বিষ্ণু' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেন। এভাবে মানুষের মাঝে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় 'অবতার' যার অর্থ 'অবতরণ করা'। এই মতবাদ অনুযায়ী স্রষ্টা মানুষরূপে অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির আকারে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। প্রাথমিকভাবে 'অবতার' বলতে 'বিষ্ণু'র দশটি প্রধান রূপকে বুঝায়। মাছের আকারে বিষ্ণুর অবতরণকে 'মৎস্য', কচ্ছপের আকারে 'কুর্মা', বন্য শূকরের আকারে 'বরাহ', আধা-মানুষ আধা-সিংহের আকারে 'নরসিংহ' ও ক্ষুদ্রকায় আকারে অবতরণকে 'বামণ' বলা হয়। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত হলো মানুষের আকারে স্রষ্টার অবতরণ যাকে বলা হয় 'রাম'। যে 'রামায়ণ' মহাকাব্যের উপর ভারতে বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ হয় এই 'রাম' তারই নায়ক।

আরেকটি জনপ্রিয় স্রষ্টা হলো 'কৃষ্ণ' যা মানুষের মাঝে 'বিষ্ণু'র আত্মপ্রকাশের আরেক রূপ। তাকে নিয়ে লিখিত মহাকাব্য হচ্ছে 'মহাভারত'। এতে রয়েছে পৃথিবীকে অপদেবতা, জনসংখ্যার আধিক্য ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মানুষের আকৃতিতে দেবতাদের অবতরণের কাহিনি।[২] সব মিলিয়ে মোট কতভাবে সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার প্রকাশ ঘটতে পারে এবং স্রষ্টা আরও কী কী প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে অনেক মত থাকলেও সেগুলোর সবগুলোই মূলত এই কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একারণেই গোটা মানবজাতির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এই বিশ্বাস লালন করে যে সৃষ্টিই স্রষ্টা অথবা স্রষ্টার অংশ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য শুধুই বাহ্যিক।

---

[১] এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ 'নিশ্চিহ্ন করা'। দুনিয়াবী কামনা থেকে মুক্ত হয়ে চিরন্তন মুক্তি লাভের পন্থা হিসেবে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বৈদিক রচনা (ভগবদগীতা এবং বেদ) থেকে এর উদ্ভব হলেও এটি মূলত বৌদ্ধধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। বৌদ্ধধর্মের হীনযান শাখায় শব্দটিকে 'বিলুপ্তি' হিসেবে ব্যবহার করলেও মহাযান শাখায় একে এক আশীর্বাদ হিসেবে দেখা হয়। (*ডিকশনারি অব ফিলোসফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন;* পৃ-৩৯৩)।

[২] এই মহাকাব্যের ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে ভগবদগীতা (ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস; পৃ-৪৪৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বৌদ্ধধর্মও হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম মতবাদকে ধারণ করে, তবে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে। এ ধর্মের বক্তব্য হলো, প্রতিটি সচেতন সত্তাই 'বুদ্ধ প্রকৃতি' ধারণ করে এবং 'বুদ্ধ' হতে সক্ষম। প্রাচীন শিক্ষা[১] অনুযায়ী বুদ্ধ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষক। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধকে অনাদি অনন্ত হিসেবে, অবিনশ্বর সত্য হিসেবে ঈশ্বরের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা সিদ্ধার্থ গৌতমের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ছিল, যেন তিনি বুদ্ধের চিরন্তন ও ঐশ্বরিকতার এ বার্তাটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।[২] এভাবেই গৌতম বুদ্ধ আর মানুষ রইলেন না, হয়ে গেলেন চিরন্তন বুদ্ধের অলীক অপচ্ছায়া। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ দিয়ে এভাবেই প্রভাবিত হয়েছে এবং ঈশ্বর ও স্বর্গের এমন অলীক ধারণা তাতে জেঁকে বসেছে। আসন গেড়ে বসেছে কল্পিত ত্রাণকর্তা হিসেবে নানান মূর্তির প্রতি অন্ধভক্তি ও ভালোবাসা। অনেকেই ধারণা করে থাকেন, 'বুদ্ধ প্রকৃতি'র মাঝে 'শাশ্বত বুদ্ধ' এবং 'বোধিসভা'র[৩] কিছু গুণাবলি আছে। যারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিচরণ করে তাদের সব অনুসারীদেরকে তাদের মেধা, নিরাপত্তা ও শিক্ষা দান করে থাকে।

শাশ্বত বোধিসভার প্রধান হলো Avalokitesvara, যাকে করুণার মনুষ্যরূপ হিসেবে ধরা হয়, প্রজ্ঞার মনুষ্যরূপ হিসেবে ধরা হয় 'মাঞ্জুশ্রী'—কে এবং শাশ্বত বুদ্ধের মধ্যে Aksobhya (প্রশান্ত), Amitabha (শাশ্বত আলো) এবং Amitayus (শাশ্বত জীবন) কে গণ্য করা হয়।

খ্রিষ্টান ধর্মে স্রষ্টার পুনর্জন্ম ধারণার উৎসমূলে রয়েছে প্রাচীন গ্রিক বিশ্বাস। স্রষ্টার মানুষে পরিণত হওয়ার প্রমাণ মেলে *গসপেল অব জন*-এর ১:১ ও ১:১৪ অনুচ্ছেদে,

---

[১] বৌদ্ধধর্মের Theravada শাখা মূলত একটি বিধিবন্ধ পন্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে থেকেই চিরন্তন মুক্তি লাভের চর্চা করতে পারে। শুধুমাত্র যেসব সন্ন্যাসীর তীব্র সহনশক্তি এবং ক্ষমতা আছে তারাই এই চর্চায় সফল হতে পারে এবং যে তা অর্জন করতে পারে তাকে বলা হয় Arhant. দুই প্রকারের নির্বাণ রয়েছে—একটি হলো 'অবশেষসহ' এবং অপরটি 'অবশেষ ছাড়া'। প্রথমটি কেবল Arhant-রাই অর্জন করতে পারে এবং এর মাঝে পাঁচটি জিনিস—স্কন্ধ—যার মাঝে সব মানুষই অন্তর্ভুক্ত; পদার্থ, সংবেদন, উপলব্ধি, পূর্বানুরাগ ও চেতনা এখনও বর্তমান। যদিও পুনর্জন্মের সনির্বন্ধ প্রার্থনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অবশেষ ছাড়াই নির্বাণ মূলত মৃত্যুর পর Arhant-এর অবস্থা বুঝিয়ে থাকে যে ব্যপারে বুদ্ধ নীরব। এক মহাকালে কেবল একজনই বুদ্ধ থাকতে পারে এবং খুব অল্প কিছু সম্ভ্রান্তেরই এই আলোকপ্রাপ্তির সৌভাগ্য জোটে। বৌদ্ধধর্মের এই মতবাদকে বলা হয় *হীনযান*।

[২] *ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস;* পৃ. ১২৯।

[৩] এই শব্দটি মূলত প্রাচীন বুদ্ধদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যারা তাদের আলোকপ্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকতেন। মহাযান শাখার বিশ্বাস অনুযায়ী অন্য সবকে আলোকপ্রাপ্তিতে সাহায্য করার জন্যই বোধিসভা তার চূড়ান্ত আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে নির্বাণ লাভে বিলম্ব করে থাকে। (*ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স;* পৃ. ১১২)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেখানে বলা হয়েছে- "শুরুতে ছিল শব্দ (logos), শব্দটি ছিল স্রষ্টার সাথে এবং শব্দটাই ছিল স্রষ্টা"। এরপর *জন*-এর লেখক আরও বলেন, "...এবং শব্দটি পরিণত হয় রক্তে, এরপর পরিপূর্ণ দয়া ও সত্যের সাথে তা আমাদের ভেতর বাস করতে থাকে..."। যদিও গ্রিক শব্দ logos কে 'শব্দ' হিসেবে অনুবাদ করা হয়, কিন্তু মূলত এর সমার্থবোধক কোনো বাংলা শব্দ নেই।

৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রিক দর্শনশাস্ত্রে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টান চিন্তাবিদেরা একে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করেছেন। এটা পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের নীতি হিসেবে প্রথম হেরাক্লিয়াস কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও অ্যারিস্টটলের সময়ে অবস্তুগত শক্তি 'ন্যুস' কর্তৃক বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বস্তুগত শক্তি তৈরি করে। Logos পুনরায় স্টোইকস-এর ব্যবস্থায় ফিরে আসে, যারা তাদের 'পরমকারণবাদ'—কে Logos ও God উভয় শব্দে ব্যাখ্যা করে। ইহুদি আলেকজান্দ্রিয়ান দার্শনিক ফিলো ওল্ড টেস্টামেন্ট এর গঠনমূলক শব্দকে স্টোইক এর logos হিসেবে চিহ্নিত করেন। এভাবেই পৃথিবীতে স্রষ্টার নিজেকে প্রকাশ করার সীমাহীন নীতি হয়ে দাঁড়ায় logos. এছাড়া logos এর একটি পরিত্রাণমূলক কাজও রয়েছে আর তা হলো এটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির একটি মাধ্যম। *গসপেল অব জন* অনুসারে logos একই সাথে গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক; তবে শেষের গুণটিকে প্রথমটির চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।[১]

এই বিশ্বাসের পেছনে যে কারণ রয়েছে তার ফলেই আদি পাপ (original sin) এবং শাশ্বত ত্যাগের ধারণার উদ্ভব ঘটে। বলা হয়ে থাকে, আদমের পাপ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়ে এত বেশি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, তা আর কোনো মানুষের ছোটোখাটো ত্যাগ স্বীকার দ্বারা মুছে ফেলা সম্ভব নয়; বরং এজন্যে প্রয়োজন একটি বড় মাপের ত্যাগ। এমন বিশ্বাসের সূত্র ধরেই এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, স্রষ্টার এক পুত্র রয়েছেন যার মধ্যে স্বয়ং স্রষ্টা অবস্থান নিয়েছেন। পরবর্তীকালে স্রষ্টার এই পুত্রই সব মানুষের পক্ষ থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিজেকে স্রষ্টার নিকট উৎসর্গ করেন। এরপর তাকে পুনরুত্থিত করা হয় এবং বর্তমানে তিনি স্রষ্টার আসনের ডানদিকে বসে পৃথিবী ধ্বংসের পর সব মানুষের বিচারের জন্য অপেক্ষা করছেন। এ কারণে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে যে,

[১] *ডিকশনারি অব ফিলোসফি এন্ড রিলিজিয়নস;* পৃ-৩১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পৃথিবীর এই এক এবং একমাত্র জায়গায় স্রষ্টা মানুষের রূপ নিয়েছেন। আর তাই পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য স্রষ্টার মনুষ্যরূপ ধারণে বিশ্বাস করা একান্ত জরুরি।

খ্রিষ্টানরা মনে করে যে, মানুষের মাঝে একমাত্র তাঁকেই স্রষ্টার আসনে উন্নীত করা যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু অনুসারীও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মতো মানুষকে স্রষ্টার আসনে আসীন করার এই গর্হিত বিশ্বাস পোষণ করে।

তথাকথিত সুফিবাদী আধ্যাত্মিকতা থেকে তাদের এই বিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটেছে, যার মূলে রয়েছে প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ধর্মসমূহ। আধ্যাত্মিকতা বলতে বোঝায় স্রষ্টার সাথে মানুষের একীভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলে বিশ্বাস করা। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর লেখনীতে ও বিভিন্ন আলোচনা সভায় এই ধারণার প্রস্তাব করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে মানুষের আত্মা আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে অবশেষে স্রষ্টার সাথে মিলিত হয়।[১] এ ধরনের ধারণার ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস করা যে—'মানুষ বস্তুজগতে আটকে পড়া স্রষ্টার একটি অংশ'। দৈহিক কাঠামো মানুষের আত্মাকে ঢেকে রাখে। আত্মা তাদের দৃষ্টিতে একটি শাশ্বত সত্তা। বস্তুজগতে আটকে পড়া স্রষ্টার এই অংশ নিজেকে মুক্ত করে পুনরায় স্রষ্টার সাথে মিলিত হয়।

মুসলিমদের মধ্যেও একটি দল আছে যারা ঠিক একই রকম মতবাদ প্রচার করে থাকে। এই মতবাদের অনুসারীদের বলা হয় 'সুফি' এবং এই মতবাদকে বলা হয় 'সুফিবাদ'। একে ইংরেজিতে বলা হয় 'Mysticism' অথবা 'Islamic mysticism'। এই মতবাদও গ্রিক আধ্যাত্মিকতাবাদের ভিত্তিতে রচিত যেখানে বলা হয় মানুষের আত্মা শাশ্বত এবং আধ্যাত্মিক চর্চার নির্দিষ্ট কিছু স্তর পেরিয়ে তা স্রষ্টার সাথে পুনর্মিলিত হয়।

সুফিদের বিভিন্ন দল এই চর্চার কিছু বিশেষ নিয়ম তৈরি করেছে যেগুলোকে তারা বলে *'তরিকা'* তথা নিয়ম বা পন্থা। প্রতিটি *তরিকার* নামকরণ করা হয়েছে তার প্রকৃত কিংবা কথিত প্রতিষ্ঠাতার নামে এবং প্রতিটি *তরিকার* কিছু বিশেষ নিয়মকানুন আছে যেগুলো তার অনুসারীদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। বেশিরভাগ *তরিকাই* তাঁর অনুসারীদের শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, কিছু নির্দিষ্ট আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও দৈহিক চর্চার পরে তারা মহান স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে পারে। এই মিলনকে তারা অভিহিত করেন

---

[১] *কলিয়ারস এনসাইক্লোপিডিয়া;* খণ্ড-১৭; পৃ-১১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ফানা'—যার অর্থ 'মিশে যাওয়া বা বিলীন হয়ে যাওয়া'[১]—অথবা *'ওসূল'*—যার অর্থ 'সাক্ষাৎ, আগমন বা মিলন'—এসব আরবি শব্দ দিয়ে।

'স্রষ্টার সাথে মিলন' এর এই ধারণা *সালাফ আস-সালিহীন*[২] থেকে নিয়ে শুরু করে আজ পর্যন্ত মূলধারার সব হকপন্থী আলিমগণ প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বহু সাধারণ মুসলিম এসব ভ্রান্ত মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দশম শতাব্দীর একজন নিবেদিতপ্রাণ সুফি আল হাল্লাজ (৮৫৮–৯২২) প্রকাশ্যে নিজেকে স্রষ্টা ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে তিনি বহু কবিতা লিখেছেন, এমনকি *'কিতাব আত-তাওয়াসিন'* নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'তুমি যদি স্রষ্টাকে চিনতে না পার, অন্তত তাঁর নিদর্শনকে চেনো; আমিই চূড়ান্ত শাশ্বত সত্য, কারণ সত্যের মাঝেই আমি শাশ্বত সত্য। আমার বন্ধু ও শিক্ষকেরা হলেন ইবলীস[৩] ও ফিরআউন। ইবলীসকে আগুনের ভয় দেখানোর পরও সে তার ও স্রষ্টার মাঝে কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি এবং আমাকে যদি হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধও করা হয়, আমার হাত-পা কেটে ফেলা হয়, তবুও আমি আমার মতবাদ পরিত্যাগ করব না।'[৪]

ইব্ন আরাবী (মৃত্যু ১২৪০ইং) স্রষ্টার সাথে মিলনের ধারণাকে আরও একধাপ এগিয়ে গ্রহণ করেছেন এই বলে যে 'একমাত্র স্রষ্টাই অস্তিত্বশীল'। তিনি তার বইতে লিখেছেন- 'কত মহান তিনি যিনি দৃশ্যমান সবকিছু তৈরি করেছেন যখন তিনি নিজেই তাদের নির্যাস।'[৫] অন্য জায়গায় তিনি লিখেন, 'যা কিছুই ঘটে তিনি তারই নির্যাস এবং যা কিছু লুকায়িত আছে তিনি তারও নির্যাস যখন তিনি দৃশ্যমান। তাঁকে তিনি ছাড়া আর কেউই দেখতে পায় না এবং কেউই তাঁর থেকে লুক্কায়িত নয় কারণ, তিনি লুক্কায়িত থেকেও দৃশ্যমান।'[৬] তাঁর এই মতবাদের নাম দেওয়া হয় *'ওয়াহদাত-উল-উজুদ'* এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সুফিদের মাঝে এই মতবাদের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

---

[১] *এহইয়াউ উলূম আদ-দ্বীন;* খণ্ড-৪; পৃ-২১২।

[২] ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমগণ—রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবা, সাহাবাদের ছাত্ররা এবং সেসব ছাত্রদের ছাত্ররা।

[৩] ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী শয়তানের প্রকৃত নাম।

[৪] *আইডিয়া অব পার্সোনালিটি;* পৃ-৩২।

[৫] *আল ফুতুহাত আল মাক্কিয়্যাহ;* খণ্ড-২; পৃ-৬০৪।

[৬] *ফুসুস আল হিকাম;* খণ্ড-১; পৃ-৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে তা হলো, 'স্রষ্টা কি সত্যিই মানুষ হতে পারেন?' যুক্তি বলে, 'না'। কারণ, স্রষ্টার মানুষে পরিণত হওয়ার মতবাদ স্বয়ং স্রষ্টার সংজ্ঞাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। মানুষ সাধারণভাবে বলে থাকে, স্রষ্টা সবকিছু করতে সক্ষম; তিনি যা করতে চান তাই করতে পারেন। খ্রিষ্টানদের বাইবেলে বলা হয়েছে, "...স্রষ্টার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।" (মথি, ১৯:২৬; মার্ক, ১০:২৭, ১৪:৩৬)

মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন বলে,

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আল বাকারা, ২:২০)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোও একই ধরনের কথা বলে। সবগুলো প্রধান ধর্মগ্রন্থই স্রষ্টার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে একই ধরনের কথা বলে। তিনি সবকিছু থেকে মহান এবং তাঁর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। এই সাধারণ ধারণাটিকে বাস্তবে বুঝতে হলে একজনকে প্রথমেই স্রষ্টার গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। অধিকাংশ সমাজেই স্রষ্টাকে একজন চিরন্তন সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয় যার কোন শুরু কিংবা শেষ নেই। এখন, স্রষ্টা সবকিছুই করতে সক্ষম, এর ভিত্তিতে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'স্রষ্টা কি মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম?' তাহলে এর উত্তর কী হবে? যেহেতু 'মৃত্যুবরণ করা' 'সবকিছু'র একটি অংশ সেহেতু এটা কি বলা যেতে পারে, "যদি তিনি চান?" না, কখনোই এটা বলা যেতে পারে না।

এখানেই সমস্যা। স্রষ্টাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় চিরন্তন সত্তা হিসেবে যাঁর কোনো শেষ নেই; আর মৃত্যুর অর্থই হলো 'কোনো কিছুর শেষে উপনীত হওয়া'। ফলে, 'স্রষ্টা মারা যেতে পারেন কি না'—এ ধরনের প্রশ্ন একেবারেই অর্থহীন এবং স্রষ্টার সংজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক। একইভাবে, 'স্রষ্টা জন্মগ্রহণ করতে পারেন কি না' এই ধরনের প্রশ্নও অবান্তর, কারণ ইতিমধ্যেই স্রষ্টাকে শাশ্বত সত্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যাঁর কোন শুরু নেই। জন্মগ্রহণ করা অর্থ একটি শুরু থাকা, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসা। এই ধারণা থেকেই নাস্তিক দার্শনিকগণ আস্তিকদেরকে উপহাস করে জিজ্ঞেস করে, "স্রষ্টা কি এমন পাথর তৈরি করতে সক্ষম যা তার পক্ষে ওঠানো অসম্ভব?" সেই আস্তিক যদি বলে থাকে—"হ্যাঁ", তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, স্রষ্টা তাঁর নিজের থেকে উচ্চতর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু তৈরি করতে সক্ষম। এবং যদি সে উত্তর দেয়, "না", তাহলে এর অর্থ হয় স্রষ্টা সবকিছু করতে অক্ষম।

তাই "স্রষ্টা সবকিছু করতে সক্ষম" বাক্যের 'সবকিছু' শব্দ থেকে সেগুলো বাদ যাবে যেগুলো স্রষ্টার গুণাবলির সাথে সাংঘর্ষিক। এর মাঝে এমন কিছু থাকবে না যেগুলো তাঁর শাশ্বত গুণাবলির বিরুদ্ধে যায় এবং তাঁকে নিম্নতর আসনে নামিয়ে দেয়। যেমন, ভুলে যাওয়া, ঘুমানো, অনুশোচনা, বেড়ে উঠা, পানাহার ইত্যাদি। বরং 'সবকিছু' শব্দের ভেতর কেবল সেসব বিষয়ই থাকবে যেগুলো তাঁর স্রষ্টা হওয়ার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ—"স্রষ্টা সবকিছু করতে সক্ষম" এর অর্থ এটাই। একে পরম অর্থে বোঝা যাবে না, সীমিত অর্থে বুঝতে হবে।

স্রষ্টার মানুষে রূপান্তরের দাবি খুব স্বাভাবিক কারণেই অযৌক্তিক। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছেন; আর স্রষ্টার পক্ষে মানুষের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা বেমানান। বরং সৃষ্টি হলো স্রষ্টার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। স্রষ্টা যদি তাঁর সৃষ্টিতে পরিণত হন তবে এর অর্থ দাঁড়ায়, স্রষ্টাই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন, যা স্পষ্টই অযৌক্তিক। সৃষ্ট হতে হলে প্রথমে তাঁকে অস্তিত্বহীন হতে হবে, আর যদি তিনি অস্তিত্বহীন হন তবে কীভাবে নিজেকে সৃষ্টি করবেন? অধিকন্তু যদি তিনি সৃষ্ট হন তবে এর অর্থ হয় তাঁর একটি শুরু আছে যা কিনা তাঁর শাশ্বত চিরন্তন হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। স্বাভাবিক নিয়মেই সৃষ্টির একজন স্রষ্টা প্রয়োজন। সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন একজন স্রষ্টার যিনি তাদেরকে অস্তিত্বে নিয়ে আসবেন। স্রষ্টার কোনো স্রষ্টা প্রয়োজন হতে পারে না, কারণ তিনি নিজেই স্রষ্টা। সুতরাং এখানে শব্দগুলোর মধ্যেই স্পষ্ট বৈপরিত্য আছে। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির রূপ নিয়েছেন এই দাবির অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর একজন স্রষ্টার প্রয়োজন—যা একটি চরম হাস্যকর ধারণা। এটা স্রষ্টার অসৃষ্ট হওয়া, অমুখাপেক্ষী হওয়া এবং স্রষ্টা হওয়ার প্রধান ধারণাগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

মানুষকে স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নীতকরণ

সৃষ্টি হিসেবে মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মারা যায়। এগুলো এমন বৈশিষ্ট্য যেগুলোকে স্রষ্টার উপর অর্পণ করা যায় না। কারণ এগুলো স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির সমতুল্য করে দেয়। সুতরাং স্রষ্টা কখনোই মানুষের রূপ নেয়নি এবং নেবেনও না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরপক্ষে মানুষও কখনো স্রষ্টার রূপ নিতে পারে না। সৃষ্ট বস্তু কখনোই তার স্রষ্টায় পরিণত হতে পারে না। এটা অসম্ভব। একটি সময় সৃষ্ট বস্তুর কোনো অস্তিত্ব ছিল না; একজন সদা বিরাজমান স্রষ্টার প্রত্যক্ষ কর্মের ফলেই তা অস্তিত্বে আসে। যার কোনো অস্তিত্বই নেই তা কখনো নিজেকে অস্তিত্বশীল করতে পারে না।

এছাড়াও মানুষের আত্মা শাশ্বত ও চিরন্তন হওয়ার যে ধারণা রয়েছে তা মূলত এই বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করে যে, মানুষও স্রষ্টার রূপ নিতে পারে। এই মতবাদ গ্রিক ও খ্রিষ্টান আধ্যাত্মিকতাবাদ, মুসলিম সুফিবাদ ও হিন্দু ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিমূল। এই মতবাদ সব মানুষ ও জীবন্ত প্রাণীর উপর ঐশ্বরিকতা আরোপ করে। এই মতবাদ অনুযায়ী ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে স্রষ্টার অংশবিশেষ বস্তু দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে রয়ে যায়। অন্যভাবে বলা যায়, অসীম সত্তা আটকে পড়ে সসীমের ভেতর। এই বিশ্বাস সব মন্দকে স্রষ্টার প্রতি অর্পণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ভালো ও মন্দের অর্থই হারিয়ে ফেলে।

যখন মানুষের মন মন্দ কিছু ইচ্ছা করে এবং শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার অনুমতিক্রমেই তা করে ফেলে, তখন তা সত্যিই শাস্তিযোগ্য গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর ফলে 'কর্ম'-এর ধারণার সূত্রপাত হয়। এই ধারণা অনুযায়ী বর্তমান জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট হলো পূর্ববর্তী জীবনের কুকর্মের ফল। মানুষের মাঝে স্রষ্টার যে অংশ বাস করে তা যখন কোনো কুকর্ম করে ফেলে তখনই স্রষ্টা শাস্তি দিয়ে থাকেন। যদি মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্রষ্টা থেকে স্বাধীন হয়, তাহলে তারা একই সাথে স্রষ্টা ও মানুষ হতে পারে না। এভাবেই প্রতিটি মানুষ নিজেরাই দেবতায় পরিণত হয়ে যায়।

স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে বিভ্রান্তির মূল কারণ

স্রষ্টার মানুষে পরিণত হওয়া অথবা স্রষ্টা এবং মানুষ একই সত্তার মধ্যে একাকার হওয়ার এই ধারণা উদ্ভব হওয়ার প্রধান কারণ হলো, যে-মহান স্রষ্টা শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁকে চেনার অক্ষমতা। তারা স্রষ্টাকে তাদের নিজেদের মতোই বিদ্যমান বস্তু থেকে সৃষ্ট মনে করে থাকে।

মানুষ বিদ্যমান বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থা এবং আকার-আকৃতিতে রূপ দিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী নতুন বস্তু তৈরি করে। যেমন: একটি কাঠের টেবিল একসময় বনের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একটি গাছ হিসেবে ছিল এবং তার পেরেক ও স্ক্রুগুলো একসময় ভূগর্ভস্থ খনিতে লোহার আকর হিসেবে বিদ্যমান ছিল। মানুষ গাছ কেটে তাকে টেবিলের রূপ দান করে, খনি থেকে আকর সংগ্রহ করে তাকে গলিয়ে এবং ছাঁচে ঢেলে পেরেক ও স্ক্রু তৈরি করে। এরপর বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে বিভিন্ন কাজের উপযোগী একটি টেবিল তৈরি করে।

একইভাবে মানুষ এখন যেসব প্লাস্টিক চেয়ার ব্যবহার করে সেগুলো একসময় ভূগর্ভে তেলের আকারে ছিল। মানুষ যেভাবে চেয়ারে বসে থাকে সেভাবে তেলের উপর বসার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তেলের রাসায়নিক উপাদান থেকে প্লাস্টিক তৈরি করে মানুষ তা দিয়ে চেয়ার বানিয়ে ব্যবহার করে। মনুষ্য ক্ষমতার এটাই মূলকথা; মানুষ শুধু বিদ্যমান বস্তুর সংস্কার ও রূপান্তর করতে পারে। তারা গাছ সৃষ্টি করতে পারে না কিংবা তেলও তৈরি করতে পারে না। মানুষ যখন তেল উৎপাদনের কথা বলে তখন আসলে তেল শোধনের কথাই বলে। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেল সৃষ্ট হয়; অতঃপর মানুষ সেটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে শোধন করে সংস্কার করে। মানুষ গাছও সৃষ্টি করেনি। এমনকি যদি তারা বীজও বপন করে তবুও বলা যায়, যে-বীজ তারা বপন করল সেটাও তো তাদের সৃষ্ট নয়।

স্রষ্টার ব্যাপারে এমন নিদারুণ অজ্ঞতার কারণে মানুষ স্রষ্টাকে ঠিক তাদের নিজেদের মতোই মনে করে বসেছে। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে রয়েছে যে, 'স্রষ্টা নিজের প্রতিচ্ছবির উপর মানুষ তৈরি করেন; তিনি স্রষ্টার প্রতিচ্ছবিতেই মানুষকে তৈরি করেন।' হিন্দুধর্ম অনুযায়ী সৃষ্টির ঈশ্বর 'পুরুষা' যার মনুষ্য রূপ হলো 'ব্রহ্মা' এবং মানুষ যেভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক কিছু তৈরি করেছে সেভাবেই সৃষ্টির ঈশ্বরও সবকিছু তৈরি করে থাকেন।

হিন্দু দর্শন অনুযায়ী 'পুরুষা' হলো 'ব্রহ্মা'র এক বৃহৎ সন্তান, যার এক হাজার মাথা এবং এক হাজার চোখ রয়েছে। তাঁর থেকেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তার সঙ্গিনী 'বিরাজ'-এর আবির্ভাব ঘটে। শাশ্বত 'পুরুষা' বলির জন্য নিবেদিত এবং তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে চারটি প্রচলিত সামাজিক শ্রেণির (বর্ণ)[১] উদ্ভব ঘটে। পেরুষা স্তোত্রগীত অনুযায়ী ব্রাহ্মনরা 'পুরুষা'র মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়রা তার বাহু থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে এবং শূদ্ররা পা থেকে সৃষ্টি হয়েছে।[২] শূন্য থেকে স্রষ্টার পৃথিবী সৃষ্টি করার ক্ষমতা উপলব্ধিতে

[১] *ডিকশনারি অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস;* পৃ-৫৮৭।

[২] *দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা;* খণ্ড-২০; পৃ-৫৫২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অক্ষমতার কারণেই হিন্দুরা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, স্রষ্টা পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষকে তার নিজের দেহের বিভিন্ন অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের চিন্তা ও বোধশক্তি সীমিত, আর তাই মানুষ অসীমকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে না। স্রষ্টা আদমকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা হলো স্রষ্টা এই পৃথিবী শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তিনি কোনো কিছু অস্তিত্বে আনতে চান তখন শুধু বলেন, 'হও'; আর তাঁর আদেশে তা অস্তিত্ব লাভ করে। এই পৃথিবী কিংবা তার কোনো বস্তু স্রষ্টার সত্তা থেকে সৃষ্ট হয়নি। এ ধারণা স্রষ্টাকে তাঁর সেই সৃষ্টির স্তরে নামিয়ে আনে যারা কেবল বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে পারে, কোনো মৌলিক সৃষ্টিতে সক্ষম নয়। এমন বিশ্বাস পোষণকারীরা প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার একত্ববাদ অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছে। তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর সমতুল্য কোনো কিছুই নেই। তিনি যদি তাঁর নিজের সত্তা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করতেন তবে তিনি তাঁর সৃষ্টির অনুরূপ হয়ে যেতেন।

স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনো এক বা একাকার হতে পারে না

এখানে আরেকটা কথা জোর গুরুত্বের দাবি রাখে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এটা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন দুই সত্তা। স্রষ্টা যেমন তাঁর সৃষ্টির সমান বা এর কোনো অংশ হতে পারে না, তেমনি তাঁর সৃষ্টিও তাঁর সমান কিংবা তাঁর কোনো অংশ হতে পারে না।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি ভিন্ন হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অজ্ঞতা ও অবহেলার দরুন এ বিষয়টা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। না-জানার ফলে তারা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির উপাসনা করতে লেগে যায়। স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান, কিংবা স্রষ্টার ঐশ্বরিক সত্তা তাঁর সৃষ্টির কিছু অংশ জুড়ে ছিল বা আছে—এ ধরনের বিশ্বাসই স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে মানুষকে সৃষ্টির উপাসনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ধরনের বিশ্বাসই এমন ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে যে, সৃষ্টির উপাসনা করলেই স্রষ্টা বা ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। অপরদিকে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে—কেবল আল্লাহর উপাসনা করা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে ভাবেই হোক না কেন, তাঁর সৃষ্টির উপাসনা ত্যাগ করা। সব নবীগণ এই বার্তা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই এই আহ্বান নিয়ে একজন করে বার্তাবাহক পাঠিয়েছি, "তোমরা আমার ইবাদাত করো এবং মিথ্যা উপাস্য থেকে দূরে থাকো।" (আন-নাহ্‌ল, ১৬:৩৬)

বিভিন্ন ধর্মের মূর্তিপূজারীদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কেন মানুষের তৈরি প্রতিমার সামনে মাথা নত করে, তখন তাদের সবাই প্রায় এক ও অভিন্ন উত্তর দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, আমরা আসলে পাথরের প্রতিমার পূজো করছি না; বরং পূজো করছি এই প্রতিমার মধ্যে মূর্তিমান ঈশ্বরকে। তাদের দাবি, স্বয়ং পাথরের মূর্তিটিই ঈশ্বর নয় বরং ঈশ্বরের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু! যিনি এই ধ্যানধারণা পোষণ করেন যে, স্রষ্টা যেকোনো উপায়েই হোক, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারেন—প্রতিমাপূজোর জন্য তিনি এই যুক্তি মানতে বাধ্য। পক্ষান্তরে যিনি ইসলামের মূল বার্তা ও এর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝেন, যত যুক্তিই দেখানো হোক না-কেন, তিনি কখনোই প্রতিমাপূজা করতে রাজি হবেন না।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব লোক নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের এই দাবির ভিত্তি ছিল 'স্রষ্টা মানুষের মধ্যে বিরাজমান'—এই ধারণা। একধাপ এগিয়ে এদের কেউ কেউ এমনও দাবি করেছে যে, অন্যান্যদের চেয়ে তার মধ্যেই স্রষ্টা বেশি বিরাজ করে। কাজেই বাকি লোকেরা যেন তার কাছে নতি স্বীকার করে এবং তাকেই যেন ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করে। অন্যদিকে কিছু লোক ছিল যারা নিজেদের ঈশ্বর দাবি না করলেও, অন্যকে ঈশ্বর হিসেবে প্রচার করত। কথিত এসব ঈশ্বরের মৃত্যুর পর, এ লোকগুলো ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীদের সমাজে আরও ব্যাপকভাবে এসব অপবিশ্বাস ছড়াতে থাকে।

কোনো লোক যদি ইসলামের বার্তা ও এর অন্তর্নিহিত অর্থ একবার বুঝে যান, তার পক্ষে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করা সম্ভব নয়। স্রষ্টার সত্য ধর্মের মূল কথা স্পষ্ট; আর তা হলো শুধু স্রষ্টার উপাসনা করা এবং সৃষ্টির যাবতীয় উপাসনা পরিত্যাগ করা। আর এটাই ইসলামের মূলমন্ত্র—

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই।

অকপটভাবে এ কথা ঘোষণা করে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিলেই একজন লোক ইসলামের বলয়ে চলে আসেন। এ দুটো কথার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস তাকে দেয় জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের নিশ্চয়তা। নবী মুহাম্মাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ বলেছেন, "যে লোক বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং এই বিশ্বাস নিয়ে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এই ঘোষণার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে নবীর দেখানো পথে নিজের ইচ্ছাকে স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে। সেই সাথে বাদ দিতে হবে সব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা।

স্রষ্টার কি সন্তান থাকতে পারে?

স্রষ্টা যদি মানুষের রূপ না-ও গ্রহণ করে থাকেন তবে কি তাঁর কোনো সন্তান আছে? যেহেতু তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম সেহেতু তিনি তো সন্তান গ্রহণেও সক্ষম। মূলত এই দাবি স্রষ্টার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তাঁকে সৃষ্টির সমপর্যায়ে নামিয়ে আনে। সৃষ্ট প্রাণী সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে থাকে; যারা বড় হয়ে আবার নিজেরা বংশবিস্তার করে এবং এভাবেই চলতে থাকে। কুকুর, বিড়াল, গরু, মানুষ সবকিছুই বাচ্চা প্রসব করে থাকে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় স্রষ্টারও একজন সন্তান আছে বলে যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তাকে কী বলা যায়?

শিশু স্রষ্টা?

কারণ, স্রষ্টা তো নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টার জন্ম দিবে। কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে সন্তান জন্ম দিতে হলে তাঁর সাথে আরও একজন স্রষ্টা থাকতে হবে। অতএব, স্রষ্টার জন্য সন্তান জন্ম দেওয়া মোটেই শোভনীয় নয়, কারণ তা স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির স্তরে নামিয়ে দেয়।

স্রষ্টা ছাড়া বাকি সবকিছুই তাঁর আদেশবলে সৃষ্টি হয়েছে, স্রষ্টা কিংবা তাঁর অংশবিশেষ সৃষ্টির রূপ নেয়নি। স্রষ্টা না তাঁর সৃষ্টির রূপ গ্রহণ করেছেন, আর না কোনো সৃষ্টির জন্ম দিয়েছেন। স্রষ্টা কেবল স্রষ্টাই, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মহাবিশ্বে মানুষ এবং আরও যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। মানুষ শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণা উপলব্ধি করতে না পারলেও স্রষ্টা ঠিক এভাবেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুই তিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করেন। স্রষ্টার যে গুণ তাঁকে সৃষ্টি থেকে আলাদা করেছে তা হলো তিনি সবকিছু একাই শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির ধরন মানুষের রূপান্তর প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্রষ্টা মানবজাতির কাছে যে সব নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন—ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ এবং নাম না জানা আরও অসংখ্য নবী-রাসূল; আল্লাহ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন—তাঁদের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল এটাই। বর্তমানে এই নির্ভুল বাণী স্পষ্ট ও অবিকৃত আকারে পাওয়া যাবে কেবল মানবজাতির জন্য স্রষ্টার প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআনে। কারণ ১৪০০ বছর পূর্বে আল কুরআন অবতীর্ণের সময় থেকে এখন পর্যন্ত এটি সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে। যারা স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির পর্যায়ে নামিয়ে আনে তাদের উদ্দেশ্যে স্রষ্টা বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

তাঁর মতো কিছুই নেই। (আশ-শূরা, ৪২:১১)

যারা তাঁর উপর সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপ করে তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন-

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (মারইয়াম, ১৯:৯২)

যারা মনে করে আল্লাহ নিজের সত্তা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

তিনি যখন কোনো কিছু করতে চান তখন তাকে শুধু 'হও' বলে নির্দেশ দেন, আর অমনি তা হয়ে যায়। (ইয়াসীন ৩৬:৮২)

যারা স্রষ্টার সাথে উপাসনায় অন্যকে শরিক করে, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

তাঁর সাথে অন্য কোনো উপাস্য নেই। থাকলে প্রত্যেক উপাস্য তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। (আল মু'মিনূন, ২৩:৯১)

আল্লাহ নাস্তিকদের প্রশ্ন করেন,

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (আত তূর, ৫২:৩৫)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈসা ও তার মা যে মানুষ ছিলেন তা তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় বলে দিয়েছেন-

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

তারা উভয়ে খাবার খেত। (আল মা'ইদাহ, ৫:৭৫)

স্রষ্টার মনুষ্যরূপ গ্রহণ না করার ধারণা প্রত্যেক মানুষের কাছে পরিষ্কার থাকা একান্ত জরুরি। কারণ এই বিশ্বাস ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের মূল ভিত্তি। অন্য সব ধর্মেই স্রষ্টার ধারণা বিকৃত—তা যেমনই হোক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ধারণাটা পরিষ্কার থাকা উচিত তা হলো স্রষ্টা কখনোই মানুষের রূপ ধারণ করেননি। স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়; তিনি একাই তাঁর সৃষ্টির ইবাদাতের যোগ্য। কোনো মানুষকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা কিংবা কোনো মানুষ স্রষ্টা হতে পারে—এই ধারণা পোষণ করা পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ এবং মানুষের দ্বারা সম্পাদিত সর্বাধিক গর্হিত কাজ। এই উপলব্ধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটাই শাশ্বত মুক্তির ভিত্তি রচনা করে। এর পরিষ্কার জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই শাশ্বত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে কেবল বিশ্বাসই মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিশ্বাসকে নিখাদ ঈমানের রূপ দিতে হলে তা শুধু জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; বরং তাকে কাজে পরিণত করতে হবে। শাশ্বত মুক্তি লাভের জন্য একজন মানুষকে সঠিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন করতে হবে। আর তা শুরু করতে হবে স্রষ্টাকে চেনার মধ্য দিয়ে, স্রষ্টা কখনোই মানুষের রূপ ধারণ করেননি এবং ভবিষ্যতে কখনো করবেন না—এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করার মধ্য দিয়ে।

স্রষ্টাই কেবল সৃষ্টির উপাসনা লাভের অধিকার রাখেন

যেহেতু ইবাদাহ বা উপাসনার মূল কথা হচ্ছে স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, সেহেতু ইসলামের মূল বার্তাই হচ্ছে, কেবল এক ও একক স্রষ্টার উপাসনা। সেই সাথে স্রষ্টা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা অন্য সবকিছুর উপাসনা পরিত্যাগ করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ একাই সবকিছুর স্রষ্টা—বাকি সবই তাঁর সৃষ্টি—সেহেতু ইসলাম মূলত সব সৃষ্টির উপাসনা বাদ দিয়ে কেবল এক স্রষ্টাকে উপাসনার আহ্বান জানায়। একমাত্র তিনিই মানুষের উপাসনা পাওয়ার অধিকার রাখেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনিই একমাত্র মানুষের প্রার্থনা কবুল করার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই কেউ যদি কোনো গাছের কাছে কিছু প্রার্থনা করে এবং তার সেই প্রার্থনা কবুল করা হয়, তার মানে এই নয় যে, গাছটা তার প্রার্থনা কবুল করে। আসলে স্রষ্টাই তার প্রার্থনা কবুল করেছেন। সে যা চেয়েছিলো সেটা স্রষ্টাই তাকে দিয়েছেন। কেউ বলতে পারেন, "স্রষ্টা প্রার্থনা কবুল করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক"। কিন্তু সেই গাছপূজারীর কাছে কিন্তু বিষয়টি এমন না-ও মনে হতে পারে। অনুরূপভাবে যিশু, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, সাধু ক্রিস্টোফার বা সাধু যিহুদা এমনকি নবী মুহাম্মাদের কাছেও যে প্রার্থনা করা হয়, সেগুলোও কবুল করেন স্রষ্টা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, যিশু তাঁর অনুসারীদের কখনোই বলেননি যে, তোমরা আমার উপাসনা করো। বরং তিনি বলেছেন এক আল্লাহর উপাসনা করতে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

আর যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারইয়াম পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মা'কে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো?' ঈসা বলবেন, 'মহিমা আপনার, যা বলার অধিকার আমার নেই, আমি তো সেটা কখনোই বলতে পারি না'।

(আল মা'ইদাহ ৫:১১৬)

অন্যদিকে যিশুও যখন উপাসনা করেছেন, তখন তিনি নিজেকে উপাসনা করেননি; বরং তিনি আল্লাহরই উপাসনা করেছেন। গসপেলেই বলা হয়েছে,"তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।" [লুক ৪:৮]

এই একই মূলনীতি দেওয়া হয়েছে আল কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আমরা কেবল আপনারই দাসত্ব করি, এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই।"

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (আল মু'মিন, ৪০:৬০)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

- সত্য নিরূপণে আবেগ ও জড়তা পরিত্যাজ্য।
- প্রত্যেকটি ধর্মই অন্যগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।
- সত্য ধর্মে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট বিবৃত থাকতে হবে।
- সত্য ধর্মের মৌলিক বিষয় সকল শ্রেণীর মানুষের বোধগম্য হবে।
- মিথ্যা ধর্ম স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির উপাসনা করার শিক্ষা দেবে।
- সত্যধর্ম কিছু ধর্মীয় রীতিনীতিতে আবদ্ধ থাকবে না।

তৃতীয় অধ্যায় : ধর্ম

- সত্যধর্ম জীবন ঘনিষ্ঠ। প্রতিটি নিষেধের বিকল্প বিধান থাকবে।
- সত্য ধর্ম ন্যায্য, ব্যক্তির পাপ-পূণ্যের দায়ভার তার নিজের।
- সত্য ধর্মের শিক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হতে হবে।
- মিথ্যা ধর্মে স্ববিরোধীতা থাকবে।
- সত্য ধর্মের মূল বাণী স্থান ও কালের উর্ধ্বে।
- প্রৃথিবীতে সত্য ধর্ম একটিই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেটা তার নিজের বেছে নেওয়া নয়। জন্মের পর থেকেই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় পারিবারিক ধর্ম। কিংবা যে রাষ্ট্রে সে জন্মগ্রহণ করে, তার কাঁধে চাপানো হয় সেই রাষ্ট্রের মতাদর্শ। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিতে দিতে তার মধ্যে এই বিশ্বাস বা ধারণা শেকড় গেড়ে বসে যে, কেবল তার বিশ্বাস বা ধর্মই সঠিক ধর্ম; তার মতো অন্য সবারই উচিত এই একই ধর্মমত বা ভাবাদর্শ গ্রহণ করা। কিন্তু পরিণত বয়সে কেউ কেউ যখন অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারে, তখন সে নিজের ধর্মবিশ্বাসের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে।

সত্যানুসন্ধানীরা যখন দেখে প্রত্যেক ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাবাদর্শ, দর্শনই দাবি করে যে কেবল তাদের ধর্মবিশ্বাস, তাদের ভাবাদর্শ, তাদের দর্শনই একমাত্র সঠিক পথ; তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত সত্য কোনাটি? প্রত্যেক ধর্ম, ভাবাদর্শই মানুষকে ভালো কাজের কথা বলে, তাহলে কোনটি সঠিক? যেহেতু প্রত্যেকটি ধর্ম ও ভাবাদর্শই অন্যগুলোকে মিথ্যা ও ভুল সাব্যস্ত করে সেহেতু সবগুলো একসাথে তো সঠিক হতে পারে না! তাহলে একজন সত্যানুসন্ধানী কীভাবে বেছে নেবে সঠিক পথ?

সঠিক পথ বেছে নেওয়ার জন্য স্রষ্টা আমাদের দিয়েছেন বোধশক্তি ও বিচারবুদ্ধি। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এটাই। এর উপরই নির্ভর করে তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনের ভবিষ্যৎ। কাজেই আমাদের উচিত আবেগ-নির্ভর না হয়ে উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণগুলো যাচাই বাছাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

অন্যান্য ধর্ম ও ভাবাদর্শের মতো ইসলামও দাবি করে যে, এটাই স্রষ্টাপ্রদত্ত একমাত্র সঠিক জীবনবিধান। এদিক থেকে চিন্তা করলে, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের দাবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে সর্বাবস্থায় আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে তা হলো, কোনো ধরনের আবেগ ও পূর্বধারণা বাদ দিলেই কেবল প্রকৃত সত্য কোনটি তা নিরূপণ করা সম্ভব। কেননা, আবেগ ও পূর্বধারণা আমদের সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আমরা যদি এ দুটো প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারি, কেবল তখনই আমরা স্রষ্টাপ্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক ব্যবহার করতে পারব; নিতে পারব যৌক্তিক ও সঠিক সিদ্ধান্ত।

ইসলামই স্রষ্টার মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম—এই দাবির সমর্থনে তিনটি আঙ্গিকে বেশ কিছু যুক্তিপ্রমাণ দাঁড় করানো যায়:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১. ধর্মগুলোর নাম ও উৎসের অর্থবহ ব্যাপকতা।
২. স্রষ্টা, মানুষ ও সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে বক্তব্যের সরলতা।
৩. স্থান ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সবার কাছে তার প্রাপ্তির সহজতা।

কোনো ধর্ম স্রষ্টার মনোনীত সত্য ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য যুক্তি ও কারণ এই তিনটি মূল শর্তকেই নির্দেশ করে।

সত্য ধর্মের নয়টি বৈশিষ্ট্য

১. স্রষ্টার মনোনীত ধর্মের সার্বজনীনতা

ইসলাম সম্পর্কে বুঝতে হলে একজন মানুষের প্রথম যে বিষয়টি জানা ও বোঝা দরকার তা হলো 'ইসলাম' শব্দের অর্থ। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ নিজের ইচ্ছাকে একমাত্র স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া, তাঁর বশ্যতা মেনে নেওয়া। ইসলাম ধর্মের বক্তব্য মতে এই স্রষ্টা হলেন একমাত্র 'আল্লাহ'। যে ব্যক্তি নিজের যাবতীয় ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সঁপে দেন তাকে বলা হয় 'মুসলিম'। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামের উপর ভিত্তি করে ইসলাম ধর্মের নামকরণ করা হয়নি। কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা এই ধর্মের নামকরণ করেনি; যেমনটা আমরা অন্যান্য অনেক ধর্মের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। খ্রিষ্টান ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছে যিশু খ্রিষ্টের নামের উপর ভিত্তি করে। গৌতম বুদ্ধের নামের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের নাম। চীনা দার্শনিক কনফিউসিয়াসের নামের ওপর ভিত্তি করে কনফিউসিয় মতবাদ, কার্ল মার্ক্সের নামের ওপর মার্ক্সবাদ, ইহুদি গোষ্ঠীর নামানুসারে ইহুদি ধর্ম, আর হিন্দ্ [সিন্ধু] অঞ্চলের অধিবাসীদের নামানুসারে হিন্দু ধর্ম।

স্রষ্টার প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ আদাম (আ)-কে যে-ধর্ম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল, সেই ধর্মের নাম 'ইসলাম'। স্রষ্টা মানবজাতির কাছে আরও যেসব নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাঁদের সবার ধর্ম ছিল এই 'ইসলাম'। উপরন্তু স্রষ্টা নিজেই তাঁর মনোনীত ধর্মের জন্য এই নাম নির্ধারণ করেছেন। সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে 'ইসলাম'কে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। (আল মা'ইদাহ, ৫:৩)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

ইসলাম ছাড়া কেউ যদি অন্য কোনো জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণ করতে চায়, তবে সেটা কখনো গ্রহণ করা হবে না। ('আল ইমরান, ৩:৮৫)

ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়। ইসলাম বলে না যে, সপ্তম শতকে আরব উপদ্বীপে নবী মুহাম্মাদ ﷺ প্রথম এই ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। বরং ইসলাম তো একথাই বলে যে, পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী আদাম ﷺ যে-ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন—এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য নবীগণ যে ধর্ম প্রচার করেছেন—শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ সেই ধর্মকেই চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন।

নিজেকে একমাত্র সত্য ধর্ম বলে দাবি করা এমন আরও দুটো ধর্ম নিয়ে এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি। বাইবেলের কোথাও আপনি একথা খুঁজে পাবেন না যে মূসা নবীর অনুসারী ও তাঁদের বংশধরদের স্রষ্টা বলেছেন, তাঁদের ধর্মের নাম ইহুদি ধর্ম; কিংবা যিশুখ্রিষ্টের অনুসারীদের বলা হয়েছে যে, তাঁদের ধর্মের নাম খ্রিষ্টান ধর্ম। অন্যভাবে বললে, 'ইহুদি' ও 'খ্রিষ্টান' নাম দুটো স্রষ্টা দেননি। এই নাম দুটোর কোনো ঐশ্বরিক অনুমোদন বা কোনো ওহীসূত্র নেই। পৃথিবী ছেড়ে যিশুখ্রিষ্টের চলে যাওয়ার বহুবছর পর যিশুর ধর্মকে 'খ্রিষ্টান ধর্ম' নাম দেওয়া হয়েছে।

তাহলে কি যিশুর প্রচারিত ধর্মও এর নামের মতো পরিবর্তিত হয়েছে? Jesus থেকেই বাংলায় হয়েছে যিশু আর Christ থেকে বাংলায় খ্রিষ্ট; দুটোই হিব্রু শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রিক Iesous থেকে ইংরেজি ও ল্যাটিনে হয়েছে Jesus; হিব্রুতে 'Yeshua' বা 'Yehoshua' (Joshua)। হিব্রু 'Messiah' শব্দের গ্রিক প্রতিশব্দ 'Christos'। এটা একটি রাজপদবির নাম। এর অর্থ 'ঐশ্বরিক বিধানে অভিষিক্ত রাজা'।

তবে ঈসা ﷺ-এর প্রচারিত ধর্মোপদেশের মধ্যেই তাঁর মূল ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে সেটা তিনি তাঁর ধর্মোপদেশের মধ্যে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল এটাই যে, তাঁর অনুসারীরা যেন এই ধর্মোপদেশগুলোকে জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশক মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলামে জেসাস বা যিশু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন নবী, তাঁর নাম ঈসা। তাঁর আগে অন্যান্য যেসব নবী এসেছিলেন তাঁদের মতো তিনিও মানুষদের আহ্বান করছিলেন যে, তারা যেন নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দেয়। যেমন বাইবেলে বলা আছে, যিশু তাঁর অনুসারীদের শিখিয়েছিলেন, তারা যেন এভাবে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে,

> হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। [লুক ১১:২/মথি ৬: ৯-১০]

স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সঁপে দেওয়ার এই বিশ্বাসের কথা গসপেলের বহু জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন: যিশু বলেছেন, যারা নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছে কেবল তারাই জান্নাতের অধিবাসী হবে।

যিশু এটাও বলেছেন যে, তিনি নিজেও স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ করেছেন।

> যারা আমাকে 'প্রভু প্রভু' বলে তারা প্রত্যেকে যে স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সে-ই প্রবেশ করতে পারবে। [মথি ৭:২১]

> আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না; যেমন শুনি তেমনই বিচার করি। আমি ন্যা-য়ভাবে বিচার করি, আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করতে চাই না; বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছামতো কাজ করতে চাই। [জন ৫:৩০]

গসপেলে এ ধরনের আরও অনেক উক্তি আছে, যেগুলো থেকে বোঝা যায়, যিশু সুস্পষ্টভাবেই তাঁর অনুসারীদের বলেছেন যে, তিনি প্রকৃত ঈশ্বর নন। যেমন, কিয়ামাতের ব্যাপারে যিশু বলেছেন,

> সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউই জানে না—স্বর্গের দূতেরাও না, পুত্রও না, কেবল পিতাই জানেন। [মার্ক ১৩:৩২]

সুতরাং, পূর্বে আগত নবীদের মতো যিশু যে ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন, তাঁর পরে যে নবী এসেছিলেন, তিনিও সেই একই ধর্ম প্রচার করেছেন; আর সে ধর্ম হচ্ছে 'ইসলাম': কেবল এক ও একক স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. ধর্মের সব বিধান একই মূলসূত্রে বাঁধা থাকবে

গোটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা যেহেতু একজন তাই প্রতিটি সৃষ্টিই নিজের অস্তিত্বের জন্য তাঁর নিকট বাধিত। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়া নিরর্থক। স্রষ্টার সত্য ধর্মের অবশ্যই একটি মূল বক্তব্য থাকবে, যেখানে কেবল তাঁরই ইবাদাত করতে বলা হবে। তাই যে-ধর্মটি একমাত্র সত্য ধর্ম হওয়ার দাবি করছে সেখানে মানুষকে কেবল এক স্রষ্টার ইবাদাতের নির্দেশ দেওয়া উচিত। আর যেহেতু তিনি ছাড়া বাকি সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি, তাই সত্য ধর্মে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি ইবাদাতের আহ্বান করা হবে না—এটাই স্বাভাবিক। অন্য মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা বা কোনো জিনিস কখনোই ইবাদাহ পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না, কারণ এরা কেউই নিজ থেকে কারও উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউই সৃষ্টির কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের একটিই মূল বক্তব্য হওয়া উচিত, আর তা হলো একমাত্র তাঁরই ইবাদাহ করা। একমাত্র ইসলাম ধর্মই তাত্ত্বিক ও বাস্তব চর্চা—উভয় ক্ষেত্রে এক আল্লাহর ইবাদাতের নির্দেশ দেয়। একমাত্র ইসলামেই ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উভয় ক্ষেত্রেই স্রষ্টার একত্ববাদ সংরক্ষিত হয়েছে।

অন্যদিকে, খ্রিষ্টান ধর্ম তাত্ত্বিকভাবে অনেক স্থানে এক ঈশ্বরের ইবাদতের কথা বললেও এ ধর্মের বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর উল্টো। উদাহরণস্বরূপ, গসপেলে লুকের ৪:৮-এ বলা হয়েছে যে, শয়তান যিশুকে কর্তৃত্ব ও বিত্ত-বৈভবের লোভ দেখিয়ে তার নিজের ইবাদাহ করতে প্ররোচনা দিয়েছিল। "যিশু তাকে বলেছিলেন, 'তুমি কেবল তোমার প্রভুরই উপাসনা করবে এবং কেবল তাঁরই সেবা করবে।" অর্থাৎ যিশুর বাণীর মূল বক্তব্যও ছিল এটাই যে, স্রষ্টা একাই ইবাদাহ পাওয়ার যোগ্য। তাই তাঁর পরিবর্তে বা তাঁর পাশাপাশি অন্য কারও ইবাদাহ করা ভুল।

যিশুর একত্ববাদের শিক্ষা যখন গ্রিস আর রোমান দর্শনের ত্রিত্ববাদের মতাদর্শে রূপান্তরিত হয় তখন যিশুর এই স্পষ্ট সহজবোধ্য বক্তব্যও হারিয়ে যায়। যিশুকে ঈশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। তাকে ঈশ্বরের পুত্রের উপাধি দেওয়া হয়। 'ঈশ্বর বা পিতা' এবং 'ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা'-র মতোই তাকেও প্রভুত্বের অংশীদার করা হয়। খ্রিষ্টানরা যিশুকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে ঘোষণা করে। তারা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুর তথাকথিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মৃত্যুর প্রতীকস্বরূপ যিশুর প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। পরবর্তীকালে তিনিই খ্রিষ্টানদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপাস্যে পরিণত হয়েছেন।

একইভাবে হিন্দুধর্মের উপনিষদ, পুরাণ, বেদ এবং ভগবদ্গীতায় কেবল একজন নিরাকার ঈশ্বর, ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে যিনি অদ্বিতীয়। আবার ব্রহ্মা নিজেই 'ব্রহ্মা' (স্রষ্টা), বিষ্ণু (পরিচালক) এবং শিব (সংহারকর্তা)। আর বিষ্ণু থেকেই প্রতেক যুগে অবতার এসেছে। হিন্দুরা অসংখ্য মূর্তির পূজা করার মাধ্যমে সবকিছুকেই ঈশ্বর বানিয়ে নিয়েছে।

৩. ইবাদাহ-উপাসনায় ব্যাপকতা

ইসলামে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করা ও বিপদআপদে তাকে ডাকার মধ্যেই ইবাদাত সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর সব আদেশনিষেধ মেনে চলাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিকভাবে ফার্দ (ফরজ) বা অবশ্যকরণীয় দায়িত্বগুলোর প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে আল্লাহ যেগুলোকে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা। এরপরে রয়েছে নাফ্ল (নফল) ইবাদাহ, যেগুলো আল্লাহকে আরও বেশি সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দান করা, সিয়াম পালন, হাজ্জ করা, গরিব-অসহায়দের সাহায্য করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া— এগুলো সবই ইবাদাহ। এমনিভাবে নিত্যদিনের দৈনন্দিন কাজগুলোকেও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করার মাধ্যমে ইবাদাতে রূপান্তরিত করা যায়।

ইসলামের মূল কথা হলো এক আল্লাহর ইবাদাহ করা। আর এই ইবাদাহগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য লোকদেখানো নয়, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি নিবেদন করতে হবে। ।

৪. ধর্মীয় মূলনীতি অক্ষুণ্ন থাকা

শুরু থেকেই ইসলাম ধর্মের মূল বক্তব্য অবিকৃত ও অক্ষুণ্ন রয়েছে। আদাম ﷺ থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত আগত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীদের সবার প্রচারিত ধর্মের শিক্ষা ছিল একটিই—ইসলাম: একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা, তাঁর সাথে কোনো শির্ক না করা এবং নিঃশর্তভাবে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই এই আহ্বান নিয়ে একজন বার্তাবাহক পাঠিয়েছি, "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং মিথ্যা উপাস্যকে পরিহার করো।" (আন নাহ্‌ল ১৬:৩৬)

ইসলাম আরও শিক্ষা দেয় যে, যারা নিজেদেরকে ঈশ্বর দাবি করে অন্যদেরকে তাদের উপাসনা করার আহ্বান জানায় তারা অনুসারীদের কেবল প্রতারণাই করছে, তাদেরকে বিপথগামী করছে এবং আল্লাহর সত্য ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইসলামে ইবাদাতের মূলকথাকে সুরা আল ফাতিহার ৪ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-

'আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

আদম ﷺ ও হাওয়া ﷺ-কেও আল্লাহর হুকুমের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে একটি বাগানে রাখা হয়েছিল এবং কেবল একটি মাত্র গাছ ব্যতীত অন্য যেকোনো গাছ থেকে খাওয়ার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়েছিল।

প্রত্যেক যুগেই মানুষকে নবীদের মাধ্যমে কিছু কাজ করার এবং কিছু কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা নিষিদ্ধ কাজের বিপরীতে মানুষের প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে অনুরূপ অনেক কিছুকেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ এবং সুদের লেনদেন নিষিদ্ধ। কিন্তু জলেস্থলে এবং আকাশে বিচরণকারী অসংখ্য প্রাণীকে আল্লাহ হালাল করেছেন। তেমনি সুদ হারাম হলেও ব্যবসার আরও অনেক লেনদেনকেই বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

অনেকেই এমনভাবে এসব হারাম কাজে লিপ্ত হয় যেন এসব হারাম কাজ বাদ দিলে তাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে। বস্তুত মানুষকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করার জন্যই এগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই কল্যাণ আছে, কিন্তু যেগুলোতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই হারাম ঘোষণা করেছেন।

৫. ধর্মীয় বিধিনিষেধের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা

স্রষ্টার সত্য ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধানে তা বদলে যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ, ইবাদাত, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া এবং কথাবার্তা এসব বিষয়ে যিশুর প্রথম দিকের অনুসারীরা তৎকালীন ইহুদীদের মতোই ছিল। তারা বহুবিবাহ করত, মাটির উপর সিজদা করত, তাদের মহিলারা মাথা আবৃত করত, তারা শূকরের মাংস খেত না, কারও সাথে দেখা হলে তারা 'আপনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপর শান্তি বর্ষিত হোক' বলে সম্ভাষণ জানাত এবং সমকামিতাকে মৃত্যুদণ্ডতুল্য পাপ মনে করত। বর্তমানে অধিকাংশ খ্রিষ্টানরা বহুবিবাহকে ঘৃণা করে, হাঁটু গেড়ে উপাসনা করে, সন্ন্যাসিনীরা এবং বিবাহের সময় ছাড়া সাধারণ মহিলারা মাথা আবৃত করে না, তারা শূকরের মাংস খায় এবং 'হাই' বলে একে অপরকে সম্ভাষণ করে। ১৯৭০ দশক থেকে অধিকাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান সমকামিতাকে এত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেয় যে, এখন সমকামী যাজক অতিসাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আগেকার হিন্দুরা মাংস খেত, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকেও তার সাথে একই চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো এবং মন্দিরের পতিতাদের (দেবদাসী) ভোগ করত। এখন অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা নিরামিষভোজী, ব্রিটিশ শাসকদের সাথে থাকা হিন্দু সংস্কারকগণ ঊনবিংশ শতকে সতীদাহ প্রথা এবং বিংশ শতকে দেবদাসীকে বিলুপ্ত করে দেয়।

অন্যদিকে ইসলামের শিক্ষা ও চর্চা অবতীর্ণের সময় থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এবং থাকবে। ইসলামে বহুবিবাহ (স্ত্রীদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণের শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারটি) এখনো বৈধ, মুসলিমরা এখনো সালাতের সময় সিজদা করে, নারীরা পর্দা করে, শূকরের মাংশ নিষিদ্ধ, 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক' এই ভাষায় তারা পরস্পরকে সম্ভাষণ করে, সমকামিতা এখনো মহাপাপ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তারা এখনো কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করে।

পক্ষান্তে যেসব খ্রিষ্টানরা যিশুর সময়ে থেকে একই কাজ করেছে তাদেরকে ধর্মচ্যুত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। চতুর্থ শতকে যিশু এবং তার পূর্বের সব নবীর প্রচারিত 'একত্ববাদ' পরিণত হয়েছে 'ত্রিত্ববাদে'। একইভাবে যদিও হিন্দুধর্মের সনাতন গ্রন্থগুলোতে মূর্তিপূজাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বর্তমানে হিন্দুদের লক্ষাধিক ঈশ্বর আছে যাদেরকে তারা মূর্তির প্রতিকৃতিতে পূজা করে।

৬. জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা

যে-ধর্মটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে তাতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকা উচিত। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে থাকবে, যদি তা সত্যিই স্রষ্টাপ্রদত্ত হয়। অথচ হিন্দুদের যদি তাদের ধর্মে উল্লিখিত জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেবে অথবা ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্ধৃতি না দিয়ে তাদের আধুনিক গুরুদের বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবে। খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাইবেলের ওল্ড বা নিউ টেস্টামেন্টে কোথাও স্পষ্টভাবে জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। একমাত্র ইসলামেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। চির অপরিবর্তনীয় শাশ্বত গ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় জীবনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।
(আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

অতএব, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহর ইবাদাহ করা। সত্যি বলতে এটা যেকোনো ধর্ম—বিশেষ করে সত্য ধর্মের মূল বিষয় হওয়া উচিত। আর এটা কেবল ইসলামের মধ্যেই আছে।

৭. সবার জন্য পাপ থেকে মুক্তিলাভের উপায় থাকা

সত্য ধর্মের আরেকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো পাপ থেকে নিষ্কৃতির ক্ষেত্রে তা সবাইকে সমান বিচার করবে। পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন থাকবে না, কারণ স্রষ্টাই কেবল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। আদাম ও হাওয়াকে ﷺ সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই আল্লাহ জানেন যে, তারা তাঁর হুকুম অমান্য করবে এবং তাঁর নিষেধ করা গাছ থেকে খাবে। তাই তিনি তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে পাপ থেকে তাওবা করতে হবে। এরপর যখন তারা পাপ করে ফেললেন, তারা তাওবা করলেন, তখন আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। যদি আল্লাহ তাদের তাওবা করতে না শেখাতেন তাহলে সেই পাপ যিশু পর্যন্ত তাদের পরবর্তী সব প্রজন্মে বংশ পরম্পরায় চলে আসত—যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে। অবশ্যই এটি হতো অন্যায্য। কিন্তু স্রষ্টা সম্পূর্ণ ন্যায্য। তাই এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় শিক্ষা দেবেন। অধিকন্তু, কোনো মানুষই তার পিতামাতা বা সন্তানদের পাপের জন্য দায়ী নয়; বরং তারা প্রত্যেকেই নিজ পাপের জন্য দায়ী। কেউ কারও পাপের বোঝা বইবে না।

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

একজন আরেকজনের পাপের বোঝা বহন করবে না। (আন-নাজ্‌ম, ৫৩:৩৮)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বরং প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত সরাসরি সৃষ্টিকর্তা-প্রভু-প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং তিনিও তাদের ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

বলো, "আমার দাসেরা! যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন।" (আয-যুমার, ৩৯:৫৩)

যেহেতু সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদাহ করা এবং এটাই সত্য ধর্মের প্রধান ভিত্তি; তাই হত্যা, চুরি ইত্যাদি যদিও পাপ কিন্তু এই পাপগুলো মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। সবচেয়ে বড় পাপ হলো আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করেছেন তা পালন না করা। তাই সবচেয়ে ভয়ানক পাপ হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা; কারণ এটা হলো এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে সংঘটিত নিকৃষ্টতম পাপ। তাই শির্কে নিপতিত অবস্থায় একজন মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে এই শির্কের অপরাধে তার সব ভালো কাজও বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ

আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার পাপকে কিছুতেই ক্ষমা করেন না। (আন-নিসা, ৪:৪৮)

ইসলামে প্রবেশ করলে আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন; এমনকি তা যদি শির্কের পাপও হয়।

কোনো ধর্মকে সত্য হতে হলে অবশ্যই তার মধ্যে সব যুগের সব মানুষের জন্য মুক্তির উপায় থাকতে হবে—চাই সে সত্য ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারুক কিংবা না পারুক। একজন মানুষ কোথায় জন্মগ্রহণ করবে সেটা তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তাই সত্য ধর্মের সন্ধান না পাওয়ার কারণে তাকে দোষারোপ করা যায় না।

মুসা, ঈসা ﷺ অথবা বুদ্ধ বা কনফিউসিয়াসের আনিত ধর্মের সাথে যার পরিচয় হয়নি তার পক্ষে তো তাদের ধর্ম অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অথচ এসব ধর্মানুসারে মুক্তি কেবল তারাই পাবে যারা তাদের অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, মানব জাতির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যারা আন্তরিকভাবে মন থেকে এক ও একক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্রষ্টা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, সে-ই পরকালে পুরস্কৃত হবে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা বিশ্বাস করে এবং [নবী মুহাম্মাদের আগমনের পূর্বে] ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবিয়ানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষদিবসে বিশ্বাস করে সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে অবশ্যই পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

(আল বাকারা, ২:৬২)

ইসলাম অনুযায়ী সব নবীদের অনুসারীরাই মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে কেবল এক আল্লাহর কাছেই সমর্পণ করেছে এবং কেবল তাঁরই ইবাদাহ করেছে, আর এটাই 'মুসলিম' শব্দের অর্থ।

যেসব নবীরা স্রষ্টার প্রকৃত বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকেই বিশ্বাস করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যুগে যুগে স্রষ্টা অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যারাই তাঁদের বার্তাকে অস্বীকার করেছে, পরকালে তারা কখনোই মুক্তি পাবে না। নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন যে, বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীদের পাঠানো হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই এই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন: 'এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই।'

ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই সব মানুষ এই বার্তা পেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানব আদমকে عليه السلام সৃষ্টির পর তার সব বংশধরদের আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে একমাত্র তাঁর ইবাদাহ করার স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। প্রতিটি আত্মাই তখন এই সাক্ষ্য প্রদান করেছিল। এই সাক্ষ্য প্রতিটা মানুষের অন্তরে মুদ্রিত হয়ে আছে। আর এটাই হলো আল্লাহকে জানা ও তাঁর ইবাদাহ করার সেই সহজাত প্রবণতা। যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তখন নাস্তিকও সাহায্যের জন্য অবচেতন মনে আল্লাহকে ডেকে ওঠে। সব আত্মার কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর যখন তোমার প্রভু আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বললেন (এই বলে যে), "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।" এটা এজন্য যে, তোমরা যেন পুনরুত্থানের দিন না বলো, "আমরা তো এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"

(আল আ'রাফ, ৭:১৭২)

মানুষ এই জগতে আগমনের পূর্বেই রুহের জগতে সাক্ষ্য গ্রহণের এ-ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। যখন একজন মানুষ পরিণত বয়সে উপনীত হয়, যখন সে সত্য ধর্মের সন্ধান পায় তখন তার উপর তা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক। তার উচিত নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা। তবে কিছু লোক থাকতে পারে যারা লোকালয় থেকে দূরে থাকা কিংবা অন্য কোনো কারণে তাদের জীবনে কখনোই সত্য ধর্মের সন্ধান পায়নি। কিছু লোক এমনও থাকতে পারে শারীরিক বা মানসিক কোনো বৈকল্যের কারণে যাদের পক্ষে ধর্মের কথা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

রাসূল না-পাঠানো পর্যন্ত আমি লোকদের শাস্তি দিই না। (আল ইস্‌রা, ১৭:১৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির ইবনে কাসিরে উপরে বর্ণিত মানুষদেরে ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, এসব লোকদের পরীক্ষা নেওয়া হবে বিচার দিবসে। তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে প্রাপ্ত বয়সে সুস্থ মস্তিষ্ক ও শারীরিক সক্ষমতাসহ। তারপর তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার নিবেন এবং তাদের সম্মুখে একটি আগুনের দেওয়াল তৈরি করবেন। একজন দূত আগুনের ভেতর থেকে এসে তাদের কাছে আল্লাহর বাণী শোনাবে—তাঁর একত্ব এবং তিনিই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য এই বিষয়সমূহ বুঝিয়ে বলবে। এরপর সেই দূত তাদেরকে সেই আগুনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলবে। যারা তার কথা শুনে প্রবেশ করবে তারা দেখবে দরজার অন্যপাশে রয়েছে জান্নাতের বাগানসমূহ এবং তাদের ভাগ্যে থাকবে জান্নাত। কিন্তু যারা প্রবেশ করতে অসম্মতি জানাবে তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে, দুনিয়াতেও যদি তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাত তবে সেখানেও তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাত। এভাবেই এমন কেউই বাকি থাকবে না, যার কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর আগেই তাকে বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে হাজির করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সত্য ধর্ম সম্পর্কে কোনো ধারণা লাভের পূর্ব থেকেই সব মানুষের অন্তঃকরণে এমন এক বার্তা প্রবেশ করানো আছে, যেন তাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদাহ করার একটি সহজাত প্রবণতা থাকে। অধিকন্তু মানুষ অনেক সত্যের মুখোমুখি হয় এবং এই পৃথিবীর জীবনে নানাভাবে তাদেরকে সত্যের নিদর্শন দেখানো হয়। সত্য গ্রহণের সুযোগও তাদের দেওয়া হয়। সত্যকে গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হয় যেন কেউ নিজের পথভ্রষ্টতার জন্য অন্য কাউকে দায়ী করতে না পারে। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অনেক ধরনের নিদর্শন দেখান, যদি সত্যি তারা আন্তরিক হয়ে থাকে তবে এগুলো তাদের সত্য ধর্ম খুঁজে বের করতে অনুপ্রাণিত করবে। চতুর্দিকে এমনকি তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব যেন তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি সত্য। (ফুসসিলাত, ৪১:৫৩)

৮. ধর্ম গ্রন্থের সংরক্ষণ

কোনো ধর্মকে সত্য ধর্ম বলে দাবি করতে হলে সে-ধর্মের একটি সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থ থাকতে হবে যা সত্যি স্রষ্টার বাণীকে ধারণ করছে। এই গ্রন্থটি চিরকাল অপরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ থাকা উচিত। তবে এর পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলোকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ স্রষ্টা নতুন গ্রন্থ দিয়ে আরও নবী পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন শেষ নবী ও রাসূল পাঠালেন তখন তার আনীত বার্তা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হতে হবে, কারণ তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে কেবল ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনই অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। অন্য কোনো ধর্মের কোনো গ্রন্থই অবিকৃত নেই। এসব ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ স্বীকারও করে নিয়েছেন যে, কালের আবর্তে তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তারা একথাও স্বীকার করেছেন যে তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ তাদের ধর্মের প্রবর্তকদের মৃত্যুর অনেক পরে লেখা হয়েছে এবং তাদের হুবহু কথাগুলো তাদের জানাও নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থগুলোর লেখককেও শনাক্ত করা যায় না।

অন্যদিকে ইসলামের চূড়ান্ত বাণী সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত রয়েছে আল কুরআনে। এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে সংরক্ষিত একমাত্র গ্রন্থ। এর পূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থকে এভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। এটা এমন একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি কথা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। কুরআন কেবল একটি লিখিত কপির মাধ্যমেই সংগৃহীত হয়নি; বরং যুগে যুগে অসংখ্য মুসলিমের অন্তরের অন্তঃস্থলে এটি সংরক্ষিত হয়েছে। এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআনকে মুখস্থ করেছে। নবী মুহাম্মাদের ﷺ সময় থেকে এযাবৎ শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ কুরআন মুখস্থ করে এর সংরক্ষণ করে যাচ্ছে।

৯. মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অলৌকিকত্ব

সত্য ধর্মের আর যে একটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা হলো যে-নবী এই ধর্ম প্রচার করেছেন তিনি অলৌকিক এমন কিছু রেখে যাবেন যেটা এই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের কাছে নিদর্শন হয়ে থাকবে। কেবল ইসলামেই আছে এমন চিরন্তন অলৌকিকত্ব। আর সবচেয়ে বড় সেই অলৌকিক মু'জিযা আল কুরআন নিজেই। কুরআনে এমন অনেক তথ্য রয়েছে যা ১৪০০ বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কুরআনে এমন অনেক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা ১৪০০ বছর পূর্বে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষে জানা একেবারেই অসম্ভব ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানীরা কুরআনে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থার একেবারে সঠিক বিবরণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন, অথচ খালি চোখে এটি দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রায় এক হাজার বছর পর মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ কুরআনে যে ধাপগুলো বর্ণিত হয়েছে তা দেখার জন্য মাইক্রোস্কোপ আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ — ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ — ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে এক নিরাপদ আধারে [নারীর গর্ভে] শুক্রবিন্দু রূপে রাখি। তারপর শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে এবং জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। এরপর মাংসপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করি আর সেই হাড়গুলোকে ঢেকে দিই মাংস দিয়ে। শেষে তাকে আরেক রূপ দেই। নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

(আল মু'মিনূন ২৩:১২–১৪)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ড. কিথ মুর অ্যানাটমি ও ভ্রূণবিদ্যায় বিশ্বের একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রূণবিদ্যায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকটি তাঁর লিখিত। এতে তিনি বলেছেন যে, পনের বা ষোল শতকে মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে মানব ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে কারও-ই তেমন কিছু জানা ছিল না। একবার একটি সেমিনারে কিথ মুরকে ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়। আয়াতসমূহ পড়ার পর তিনি বলেন, 'কুরআনের ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কিত বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারছি বলে আমি খুবই আনন্দিত। এটা আমার কাছে সুস্পষ্ট যে এই বাণী ঈশ্বরের পক্ষ থেকেই মুহাম্মাদের কাছে এসেছে; কারণ এতে বিবৃত বিষয়ের প্রায় সবগুলোই অনেক অনেক শতাব্দী পর আবিষ্কৃত হয়েছে। এটাই আমার কাছে প্রমাণ করেছে যে, মুহাম্মাদ অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত দূত।' যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে তিনি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করেন কি না, তিনি উত্তরে বলেন, 'এটি মেনে নেওয়ায় আমার কোনো অসুবিধা নেই।'

কুরআনে পাহাড়, সমুদ্র, মেঘ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কিত আরও অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলো মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বেও মানুষের জানা ছিল না। যদিও কুরআনে বিজ্ঞানের বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু এটা মূলত কোনো বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বাণী মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যেকটা মানুষের আত্মিক আরোগ্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ের নির্দেশনা দেওয়া আছে কুরআনে। তাই প্রতিটি মানুষ সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে ঐশীভাবে প্রত্যাদিষ্ট এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন পড়তে বাধ্য।

অন্যান্য ধর্মগুলোর বিশুদ্ধতার দাবি ও বাস্তবতা

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন, তত্ত্ব, ধর্মীয় দল-উপদল, সম্প্রদায় রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। সবারই দাবি একমাত্র তাদের আন্দোলন বা দর্শনই সঠিক; কিংবা একমাত্র তাদের ধর্ম বা সম্প্রদায়ই স্রষ্টার নির্দেশিত সঠিক পথের উপর রয়েছে। একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবে যে, এগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিজেদের যারা সত্য পথের অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের প্রচারিত মতবাদের মধ্যে বাহ্যিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলো বাদ দিয়ে আমরা যদি এটা চিহ্নিত করতে পারি যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা মূলত কীসের উপাসনা করার জন্য ডাকছে, তাহলেই বুঝতে পারব কোনটি সঠিক আর কোনটি সঠিক নয়। কেননা, ইসলাম ব্যাতীত বাকি সব ধর্মগুলোর প্রত্যেকের মধ্যেই একটি জিনিস অভিন্ন। সেটা হচ্ছে—হয় এরা দাবি করবে সব মানুষই ঈশ্বর, কিংবা কিছু নির্দিষ্ট মানুষ ঈশ্বর ছিলেন, কিংবা এই প্রকৃতিই স্রষ্টা অথবা স্রষ্টা মানুষের কল্পনাপ্রসূত অলীক ভাবনা।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মিথ্যা ধর্মগুলোর মূল বার্তা হচ্ছে, স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উপাসনা করা। মিথ্যা ধর্মগুলো সৃষ্টিজগৎ বা কোনো সৃষ্টিকে ঈশ্বর নাম দিয়ে তার উপাসনার আহ্বান জানায়। উদাহরণস্বরূপ, নবী যিশু তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন স্রষ্টার উপাসনা করতে। কিন্তু আজ যারা নিজেকে যিশুর অনুসারী বলে দাবি করেন, তারা মানুষকে স্বয়ং যিশুর উপাসনা করার আহ্বান জানান। তারা বলেন যে, যিশুই ছিলেন ঈশ্বর।

বুদ্ধ ছিলেন একজন ধর্মীয় সংস্কারক। তিনি ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত তৎকালীন ধর্মে নানাবিধ মানবীয় রীতি প্রচলন করেন। তিনি কখনো নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেননি। তাঁর অনুসারীদের কখনো বলেননি যে, তোমরা আমার উপাসনা করো। এরপরও ভারতের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যেসব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করেন তারা গৌতম বুদ্ধকেই তাদের ঈশ্বর বলে দাবি করেন। তারা গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতি যেভাবে কল্পনা করেছেন, তার আদলে বুদ্ধের একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির পূজো করেন।

সুতরাং উপাসনার মূল লক্ষ্যবস্তু কী—এই মূলনীতির আলোকে সহজেই আমরা বুঝতে পারব কোনটি মিথ্যা ধর্ম আর কোনটি সত্য ধর্ম। বুঝতে পারব কোন ধর্মগুলো মানুষের তৈরি। স্রষ্টা আল কুরআনে বলে দিয়েছেন,

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ
اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা তো কেবল কতগুলো নামের উপাসনা করো। আর এই নামগুলো রেখেছ তোমরা আর তোমাদের পূর্বপুরুষেরা। আল্লাহ ওগুলো সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। কার্যকর নির্দেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না। এটাই সঠিক ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (ইউসুফ, ১২: ৪০)

কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, সব ধর্মই তো ভালো কথা বলে, ভালো জিনিস শেখায়; তাহলে আমরা যে ধর্মই অনুসরণ করি না কেন, তাতে কী আসে যায়? এর উত্তর হচ্ছে, সব মিথ্যা ধর্মই সবচেয়ে জঘন্য যে শিক্ষাটি দেয় সেটা হলো স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির উপাসনা করা। একজন মানুষ সবচেয়ে বড় যে পাপ কাজে নিজেকে জড়াতে পারে সেটা হচ্ছে সৃষ্টির উপাসনা। কারণ এটা মানুষ সৃষ্টির একমাত্র যে উদ্দেশ্য—স্রষ্টার উপাসনা—সে উদ্দেশ্যকেই বরবাদ করে দেয়। স্রষ্টা আল কুরআনে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার উপাসনার জন্যই সৃষ্টি করেছি।
(আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

আর তাই সৃষ্টির উপাসনা করা এমনই এক মহা পাপ, পরকালে যেটা কক্ষনো কাউকে ক্ষমা করা হবে না। যিনি এ অবস্থায় মারা যাবেন, পরকালে তিনি যেন তার ভাগ্য জাহান্নামে নিশ্চিত করে নিলেন। এটা কারও ব্যক্তিগত অভিমত নয়। স্রষ্টা তাঁর সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থে এই সত্য প্রকাশ করেছেন,

إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

যে লোক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে, আল্লাহ কক্ষনো তার পাপ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। (আন-নিসা, ৪:৪৮ ও ১১৬)

স্রষ্টা কেন তার অনুগ্রহের অসম বন্টন করলেন?

সব মানবসমাজেই উদারতা এবং নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকে একটি মহৎ গুণ মনে করা হয়। কিন্তু সবার কাছে সমপরিমাণ সম্পদ থাকলে এই দুটি গুণের একটিও বিকাশ লাভ করতে পারত না। উদারতা শুধুমাত্র তখনই অর্জন করা যাবে যখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একজন মানুষ সম্পদ জমা করে রাখার আকাঙ্ক্ষা দমন করে দরিদ্রদের দান করাটাকে একটি মহৎ কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে। অন্যদিকে আত্মাকে হিংসা এবং লোভের মতো কুপ্রবৃত্তির উপর জয়ী করতে পারলেই কেবল সন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব। আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের এই পরীক্ষাগুলোর জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করতেই সৃষ্টিকর্তা অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে পৃথিবীতে তার অনুগ্রহ অসমভাবে বন্টন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّـهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

আল্লাহ জীবিকার ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

(আন-নাহ্‌ল, ১৬:৭১)

তিনি আরও বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

আর জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো একটি পরীক্ষা মাত্র।

(আল আনফাল, ৮:২৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ

যারা বিশ্বাস করেছ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়। (আল মুনাফিকুন, ৬৩:৯)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং কারও উপর কারও মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে পরীক্ষা করে নিতে পারেন।

(আল আন'আম, ৬:১৬৫)

সম্পদ সঞ্চয়ের স্পৃহাকে এই জীবনে কিছুতেই তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। মানুষ যত পায় তত চায়। নবী ﷺ বলেছেন, 'মানুষকে এক পাহাড় স্বর্ণ দেওয়া হলে সে আরেকটি চাইবে। (কবরের) মাটি ছাড়া কোনো কিছু তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না।' [১]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

[১] সহীহ আল বুখারি, খণ্ড ৮, পৃ. ২৯৭-৯৮, নং ৪৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। (আত-তাওবাহ, ৯:১০৩)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক আছে। (আয-যারিয়াত, ৫১:১৯)

তবে দান করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দান করলে তা আল্লাহর কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

যারা বিশ্বাস করেছ! তোমরা খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান সাদাকাকে বরবাদ করে দিয়ো না। (আল বাকারা, ২:২৬৪)

পরশ্রীকাতরতা সম্পদের লোভকে আরও তীব্র করে। তাই আল্লাহ অন্যদের যা দিয়েছেন তার প্রতি লোভ করতে আমাদের তিনি নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

আর আল্লাহ তা'আলা যে সব বিষয়ে তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তা কামনা করো না। (আন-নিসা, ৪:৩২)

নবী ﷺ এই মহান উপদেশের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, 'তোমার চেয়ে যারা কম সৌভাগ্যবান তাদের দিকে তাকাও, তোমার উপরে যারা আছে তাদের দিকে তাকিও না। আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তার প্রতি যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না চাও, তবে এটাই তোমার জন্য উত্তম।'[১] আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে আরও বর্ণিত আছে যে নবী ﷺ বলেছেন, 'প্রাচুর্যতা সম্পদ দিয়ে নয় বরং আত্মতৃপ্তি দিয়ে মাপা হয়।'[২]

أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর শান্তি পায়। (আর-রা'দ, ১৩:২৮)

---

[১] সহীহ আল বুখারি, খণ্ড ৮, পৃ. ৩২৮, নং ৪৯৭ এবং সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৩০, নং ৭০৭০।
[২] সহীহ আল বুখারি, খণ্ড ৮, পৃ. ৩০৪, নং ৪৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য। এই জীবন ও মৃত্যুর মূল উদ্দেশ্যই হলো, কে উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী তা যাচাই করে নেওয়া। আর এই জীবনের পরীক্ষাগুলো অনেক সময় 'দুর্ভাগ্য' এবং বিপদআপদ রূপেও আসতে পারে। এসব পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকৃত বিশ্বাসীদের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা এবং তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করা। এ ধরনের পরীক্ষাগুলো বিপথগামী মুসলিমদের সঠিক পথে ফিরে আসার কথা মনে করিয়ে দেয়, আর অবিশ্বাসীদের জন্য এই পরীক্ষাগুলো পরকালীন শাস্তির পূর্বে এই দুনিয়ার শাস্তি স্বরূপ দেওয়া হয়।

'ধৈর্য' নামক উত্তম আত্মিক গুণটি বিকাশের মূল ভিত্তি হচ্ছে, নানা রকম বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরাই জীবনে বেশি দুঃখকষ্ট ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সা'দ ﵁ বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে মানুষের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। উত্তরে তিনি বলেন, 'নবীগণ, এরপর যারা তাদের ঘনিষ্ঠ অনুসারী তারা, এরপর যারা তাদের ঘনিষ্ঠ অনুসারী তারা। মানুষকে তার ঈমানের স্তর অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। ঈমান যত দৃঢ় হয় তার পরীক্ষা তত কঠিন হতে থাকে। আর দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে তাদের স্তর অনুযায়ীই পরীক্ষা করা হয়।' [১]

বিপদের সময় আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখার মাধ্যমেই প্রকৃত ধৈর্য অর্জিত হয়। যেমন কুরআনে বলা রয়েছে,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং ভরসাকারীদের কেবল তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত। (ইউসুফ, ১২:৬৭)

[১] সুনান আত-তিরমিযি, খণ্ড ২, পৃ. ২৮৬, নং ১৯৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ মানুষকে আরও নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে, তারা যদি আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখে তবে তাদের কঠিনতম সময়েও কেবল তিনিই তাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। (আত-তালাক, ৬৫:৩)

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

তোমরা হয়তো কোনো বিষয়কে অপছন্দ করো, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আসলে আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। (আল বাকারাহ, ২:২১৬)

আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষকে বিশেষভাবে তার প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষা করেন। তিনি কারও উপর অবিচার করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার প্রভু কারও সাথে অবিচার করেন না। (আল কাহ্‌ফ, ১৮:৪৯)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কারও উপর সাধ্যাতীত কোন ভার চাপিয়ে দেন না। (আল বাকারাহ, ২:২৮৬)

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

কেবল কাফির-অবিশ্বাসীরা ছাড়া আর কেউ আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না। (ইউসুফ, ১২:৮৭)

তাই, সূরা আল ফাত্‌হ-এ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণকারীদের শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের অনন্ত পীড়ন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

তিনি মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা নারী-পুরুষদের শাস্তি দেবেন, কারণ তারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য রয়েছে খারাপ পরিণতি। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। কত নিকৃষ্ট নিবাস সেটা! (আল ফাত্হ, ৪৮:৬)

মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার এবং দয়ার অঙ্গীকার বিশ্বাসীদেরকে এই জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষাকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস যোগায়। তাই আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আশা রাখা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

যারা বিশ্বাস করো, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (আল বাকারাহ, ২:১৫৩)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর জন্য দেশত্যাগ করে, জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে। আর আল্লাহ পুনঃপুনঃ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (আল বাকারাহ, ২:২১৮)

আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠা ধৈর্যের প্রতিদান নিশ্চিতভাবেই জান্নাত। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের এই পুরস্কারের কথা জানিয়ে বলেছেন,

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

সুসংবাদ দাও সেইসব ধৈর্যশীলদের যারা বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব। (আল বাকারাহ, ২:১৫৫–১৫৬)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধৈর্যের আরেকটি ভিত্তি রয়েছে। আর তা হলো এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, মানবজাতির উপর যত বিপর্যয় আপতিত হয় তা তাদের নিজেদের খারাপ কাজেরই ফলাফল।[১] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আসে সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; কিন্তু তিনি অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন। (আশ-শূরা, ৪২:৩০)

আসলে মানুষ যে পাপাচার করে তার বেশির ভাগই আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যদি আল্লাহ মানবজাতিকে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রাপ্য শাস্তি দিতেন তাহলে তারা সহ এ পৃথিবীর অন্য সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত। এ ব্যাপারে সূরা ফাতিরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীর বুকে চলমান কাউকেই তিনি রেহাই দিতেন না। (ফাতির, ৩৫: ৪৫)

শুহাইব ইবনু সিনান ﵁ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'মুমিনের বিষয়টা খুবই চমৎকার! তার পুরো জীবনটাই কল্যাণময়, আর এটা শুধুই মুমিনের জন্য। যখন তার ভালো সময় আসে তখন সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। তাই এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর খারাপ সময় আসলে সে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর।'[২] আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমেই এই আত্মিক উৎকর্ষতা অর্জন করা সম্ভব। তাই, কারও জন্য নির্ধারিত ভালো এবং আপাতদৃষ্ট খারাপ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে—এই বিশ্বাস ঈমানের ষষ্ঠ স্তম্ভ।

যদি ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জীবনে কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, কোথাও ভুল হচ্ছে। এমতাবস্থায় একজন প্রকৃত বিশ্বাসীকে অবশ্যই সময় নিয়ে তার জীবনের বাস্তবতাগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। হয় তার পরীক্ষাগুলো

---

[১] প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সব বিপর্যয়ই মানুষের অপকর্মের ফল। এটি আল্লাহ সূরা আর-রুম এ (৩০:৪১) উল্লেখ করেছেন। বইটির পরবর্তী অংশে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হবে।

[২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৪১, নং ৭১৩৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্পষ্ট নয় এবং সেগুলো সম্পর্কে সে সচেতন নয়, অথবা সে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গেছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। এগুলো দিয়েই আল্লাহ এই পৃথিবীতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। অবিশ্বাসী অবস্থাতেই তাদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। (আত-তাওবাহ, ৯:৮৫)

তবে এর মানে এই নয় যে, বিশ্বাসীরা তাদের জীবনে সমস্যা আর বিপর্যয় কামনা করবে। কারণ আল্লাহ তাদেরকে এই বলে দু'আ করতে শিখিয়েছেন, 'হে আমাদের রব! আমাদের উপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দেবেন না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।'[১] বরং যেসব পরীক্ষা থেকে আল্লাহ তাদের রেহাই দিয়েছেন সেগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তবে সুখের দিনে তাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা জীবনের পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে উদাসীন না হয়ে পড়ে। কারণ সুখ এবং সাফল্য প্রায়ই মানুষকে জীবনের পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে অন্ধ করে দেয়।

পথভ্রষ্টদের জন্য পরীক্ষাগুলো কখনো কখনো শাস্তির মাধ্যমে ভুল শুধরে দেওয়ার উপায় হিসাবে কাজ করে। আর এগুলো তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসতেও অনুপ্রাণিত করে। মানুষ বিপথগামী হয়ে গেলে সাধারণত সুপরামর্শ কানে তোলে না। কিন্তু তাদের উপর বা তাদের আপনজনের উপর কোনো বিপদ এলে সেটা তাদেরকে নাড়া দিয়ে যায়। তাদের মাঝে ঈমানের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকলে তারা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

(আখিরাতের) বড় শাস্তির পূর্বে আমরা দুনিয়াতে তাদেরকে ছোট ছোট শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। (আস-সাজদাহ, ৩২:২১)

---

[১] সূরা আল বাকারা ২:২৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মানবজাতিকে তাদের বিপথগামিতার-কথা-স্মরণ-করিয়ে-দেওয়া পরীক্ষাগুলো মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার-নির্যাতনের রূপেও আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া বসনিয়ার মুসলিমদের ওপর সার্বদের অকথ্য নৃশংসতার কথা বলা যেতে পারে। ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ওপর ইসরায়েলি বর্বরতা, কুয়েতে সাদ্দামের আক্রমণ, ইরাক ও আফগানিস্তানের মানুষদের উপর আমেরিকানদের নির্বিচার বোমা হামলা তথা গোটা পৃথিবীতে মুসলিম জাতির ওপর চলমান অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা সৎপথে ফিরে আসে।

(আর-রূম, ৩০:৪১)

যারা কপটভাবে ঈমান আনার দাবি করে, বিপদ আপদ আর বিপর্যয় তাদের আসল রূপ প্রকাশ করে দেয়। আর যারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে তারা যে স্বেচ্ছায় জাহান্নামকে বেছে নিচ্ছে এই পরীক্ষাগুলো এটাও পরিষ্কার করে দেয়।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

মানুষ কি মনে করে, "আমরা বিশ্বাস করি" একথা বললেই কোনো পরীক্ষা না করেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? এদের পূর্ববর্তীদেরও আমরা পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদের সুস্পষ্টভাবে জেনে নেবেন। (আল 'আনকাবূত, ২৯:২-৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপ্স-এর জন্ম জ্যামাইকার কিংস্টনে। বেড়ে উঠেছেন কানাডার টরন্টোতে। সেখানেই ১৯৭২ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 'মাদীনাহ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি' থেকে ইসলামিক অনুষদ থেকে বিএ ডিগ্রি (১৯৭৯) অর্জন করেন। এরপর রিয়াদের 'বাদশাহ সাউদ ইউনিভার্সিটি' থেকে আকীদাহর উপর অর্জন করেন এমএ ডিগ্রি (১৯৮৫)। ১৯৯৪ সালে 'ওয়েলস ইউনিভার্সিটি' থেকে ইসলামিক ধর্মতত্ত্বের উপর পিএইচডি করেন। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় ছিল "The Exorcist Tradition in Islam"।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষা, দা'ওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও এগুলোর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'প্রেস্টন ইউনিভার্সিটি-আজমান, ইউএই', 'কাতার গেস্ট সেন্টার, দোহা, কাতার,' 'নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ', 'অমদুরমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, সুদান', 'প্রেস্টন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি কলেজ চেন্নাই, ভারত', 'ইসলামিক স্টাডিজ অ্যাকাডেমি, দোহা, কাতার'।

Islamic Online University প্রতিষ্ঠার সুবাদে জর্দানিয়ান পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষ ড. বিলাল ফিলিপসকে "The 500 most Influential Muslims"-এর তালিকাতে স্থান দেয়। এ ইউনিভার্সিটিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মানুষ বিনামূল্যে Diploma এবং টিউশন ফি মুক্ত Bachelor of Arts প্রোগ্রামে পড়াশোনা করতে পারে।

SEAN PUBLICATION

ISBN 978-984-33-7676-3
9 789843 376763

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned by CamScanner